নানা ফুলের সাজি

১



৫



সূচীপত্র

[illegible] LIBRARY
Date 24.11.06
Acc. No. 12304
12304



[**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুর, পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার ছাপ রয়েছে। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, গান, প্রবন্ধ প্রভৃতি নানা বিষয় লিখেছেন। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।]

সন্ধ্যা হয়েছে, পথিক চলেছেন গোরুর গাড়িতে করে। পরদিন সকালে রাজমহলে পৌঁছলে নৌকো নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন পশ্চিমে। তিনি রাজপুত, তাঁর নাম অরিজিৎ সিংহ। বাংলাদেশে ছোটো কোনো রাজার ঘরে সেনাপতির কাজ করতেন। ছুটি নিয়ে চলেছেন রাজপুতনায়। রাত্রি হয়ে এসেছে। গাড়িতে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ একসময় জেগে উঠে দেখলেন, গাড়ি চলেছে বনের মধ্যে। গাড়োয়ানকে বললেন, ঘাটের রাস্তা ছেড়ে এখানে কেন ?

গাড়োয়ান বললে, আমাকে চিনলেই বুঝবেন কেন।

তার পাগড়িটা অনেকখানি আড় ক'রে পরা ছিল। সোজা করে পরতেই অরিজিৎ বললেন, চিনেছি। ডাকাতের সর্দার পরাক্রম সিংহের চর তুমি। অনেকবার তোমার হাতে পড়েছিলুম, এড়িয়ে এসেছি।

সে বললে, 'ঠিক ঠাওরেছেন, এবার এড়াতে পারছেন না। চলুন আমার মনিবের কাছে।'

অরিজিৎ বললেন, উপায় নেই। যেতেই হবে। কিন্তু তোমাদের ইচ্ছে প্র্ণ হবে না।

গাড়ি চলল বনের মধ্যে। এর আগের কথাটা এবার খ্বলে বলা যাক।

অরিজিৎ বড়ো ঘরের ছেলে। মোগল সম্রাট তাঁর রাজ্য নিলে কেড়ে, তিনি এলেন বাংলাদেশে পালিয়ে। এখান থেকে তৈরী হয়ে একদিন তাঁর রাজ্য ফিরে নেবেন, এই ছিল তাঁর পণ। এদিকে পরাক্রম সিং ম্বসলমানদের হাতে তাঁর বিষয়সম্পত্তি হারিয়ে ডাকাতের দল বানিয়েছিলেন। তাঁর মেয়ের বিবাহের বয়স হয়েছে; অরিজিতের সঙ্গে বিবাহ হয়, এই ছিল তাঁর চেষ্টা। কিন্তু জাতিতে তিনি অরিজিতের সমান দরের ছিলেন না, তাঁর ঘরের মেয়েকে বিবাহ করতে অরিজিৎ রাজী নন।

রাত্রি ভোর হয়ে এসেছে। তাঁকে পরাক্রমের দরবারে এনে দাঁড় করালে পরাক্রম বললেন, ভালো সময়েই এসেছ, বিয়ের লগ্ন পড়বে আর দ্ব'দিন পরে। তোমার জন্য বরসজ্জা সব তৈরী। তোমার মানহানি করব না। বন্দী করে রাখতে চাইনে, ছাড়া থাকবে। একটা কথা মনে রেখো, এই বন থেকে বেরোবার রাস্তা না জানলে কারোর সাধ্যি নেই এখান থেকে পালায়। মিছে চেষ্টা কোরো না, আর যা ইচ্ছা করতে পার।

রাত্রি অনেক হয়েছে। অরিজিতের ঘ্বম নেই, বসেছেন এসে কাশিনী নদীর ঘাটে বটগাছের তলায়। এমন সময় একটি মেয়ে, ম্বখ ঘোমটায় ঢাকা, তাঁকে এসে বললে, আমার প্রণাম নিন। আমি এখানকার সর্দারের মেয়ে। আমার নাম রঙনকুমারী। আমাকে সবাই চন্দনী বলে ডাকে। আপনার সঙ্গে পিতাজি আমার বিবাহ অনেকদিন থেকে ইচ্ছা করেছেন। শ্বনলেন, আপনি রাজী হচ্ছেন না। কারণ কি বল্বন আমাকে। আপনি কি মনে করেন আমি অস্প্ৃশ্য?

অরিজিৎ বললেন, কোনো মেয়ে কখনো অস্প্ৃশ্য হয় না, শাস্ত্রে বলেছে।

তবে কি আমাকে দেখতে ভালো নয় বলে আপনার ধারণা?

তাও নয়, আপনার র্বপের স্বনাম আমি দ্বর থেকে শ্বনেছি।

তবে আপনি কেন কথা দিচ্ছেন না?

অরিজিৎ বললেন, কারণটা খুলে বলি। করঞ্জরের রাজকন্যা নির্মলকুমারী আমার বহুদূর-সম্পর্কের আত্মীয়া। তাঁর সঙ্গে ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছি। তিনি আজ বিপদে পড়েছেন। মুসলমান নবাব তাঁর পিতার কাছে তাঁর জন্যে দূত পাঠিয়েছিলেন। পিতা কন্যা দিতে রাজী না হওয়াতে যুদ্ধ বেধে গেল। আমি তাকে বাঁচিয়ে আনব, ঠিক করেছি। তার আগে আর কোথাও আমার বিবাহ হতে পারবে না, এই আমার পণ। করঞ্জর রাজ্যটি ছোটো, রাজার শক্তি অল্প। বেশিদিন যুদ্ধ চলবে না জানি, তার আগেই আমাকে যেতে হবে। চলেছিলেম সেই রাস্তায়, পথের মধ্যে তোমার পিতা আমাকে ঠেকিয়ে রাখলেন। কী করা যায় তাই ভাবছি।

মেয়েটি বললে, আপনি ভাববেন না। এখান থেকে আপনার পালাবার বাধা হবে না, আমি রাস্তা জানি। আজ রাত্রেই আপনাকে বনের বাহিরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। কিছু মনে করবেন না, আপনার চোখ বেঁধে নিয়ে যেতে হবে, কেননা এ বনের পথের সংকেত বাইরের লোককে জানতে দিতে চন্ডেশ্বরীদেবীর মানা আছে; তা ছাড়া আপনার হাতে পরাব শিকল। তার যে কী দরকার পথেই জানতে পারবেন।

অরিজিৎ চোখ-বাঁধা হাত-বাঁধা অবস্থায় ঘন বনের মধ্যে দিয়ে চন্দনীর পিছন-পিছন চললেন। সে রাত্রে ডাকাতের দল সবাই ভাঙ খেয়ে বেহোঁশ। কেবল পাহারায় যে সর্দার ছিল সেই ছিল জেগে। সে বললে, চন্দনী, কোথায় চলেছ?

চন্দনী বললে, দেবীর মন্দিরে।

ওই বন্দীটি কে?

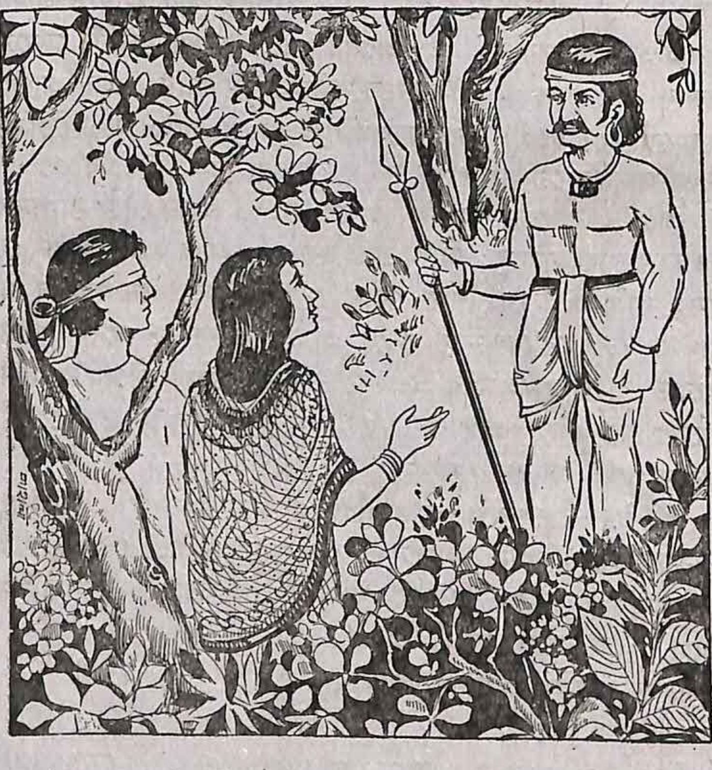
বিদেশী, ওকে দেবীর কাছে বলি দেব। তুমি পথ ছেড়ে দাও।

সে বললে, একলা কেন?

দেবীর আদেশ, আর-কাউকে সঙ্গে নেওয়া নিষেধ।

ওরা বনের বাইরে গিয়ে পৌঁছল, তখন রাত্রি প্রায় হয়েছে ভোর। চন্দনী অরিজিৎকে প্রণাম করে বললে, আপনার আর ভয় নেই। এই আমার কঙ্কন, নিয়ে যান, দরকার হলে পথের মধ্যে কাজে লাগতে পারে।

অরিজিৎ চললেন দূর পথে। নানা বিঘ্ন কাটিয়ে যতই দিন যাচ্ছে ভয় হতে লাগল, সময়মত হয়তো পেঁছিতে পারবেন না। বহু-কষ্টে করঞ্জর রাজ্যের যখন কাছাকাছি গিয়েছেন, খবর পেলেন, যুদ্ধের ফল ভালো নয়। দুর্গ বাঁচাতে পারবে না। আজ হোক কাল হোক, মুসলমানেরা দখল করে নিতে পারবে, তাতে সন্দেহ নেই। অরিজিৎ আহার নিদ্রা ছেড়ে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন



দুর্গের কাছাকাছি গিয়েছেন, দেখলেন সেখানে আগুন জ্বলে উঠেছে। বুঝলেন মেয়েরা জহরব্রত নিয়েছে। হার হয়েছে, তাই সকলে চিতা জ্বালিয়েছে মরবার জন্য। অরিজিৎ কোনোমতে দুর্গে পেঁছিলেন। তখন সমস্ত শেষ হয়ে গিয়েছে মেয়েরা আর কেউ নেই। পুরুষরা তাদের শেষ লড়াই লড়ছে। নির্মলকুমারী রক্ষা পেল, কিন্তু সে মৃত্যুর হাতে, তাঁর হাতে নয়—এই দুঃখ। তখন

মনে পড়ল চন্দনী তাঁকে বলেছিল, তোমার কাজ শেষ হয়ে গেলে পর তোমাকে এখানেই ফিরে আসতে হবে ; সেজন্যে, যতদিন হোক, আমি পথ চেয়ে থাকব।

তারপর দুই মাস চলে গেল। ফাল্গুনের শুক্লপক্ষে অরিজিৎ বনের মধ্যে পেঁছিলেন। শাঁখ বেজে উঠল, সানাই বাজল, সবাই পরল নতুন পাগড়ি লাল রঙের, গায়ে ওড়ালো বাসন্তী রঙের চাদর। শুভলগ্নে অরিজিতের সঙ্গে চন্দনীর বিবাহ হয়ে গেল।

অনুশীলনী

১। গল্পটি তোমার নিজের ভাষায় বল।
২। অরিজিত সিংহ কে ?
৩। অরিজিৎ কোথায় কাজ করত ?
৪। পরাক্রম সিংহ কে ?
৫। পরাক্রম অরিজিতের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছিলেন ?
৬। রঙনকুমারী কে ? তাঁকে কি বলে ডাকত ?
৭। চন্দনী অরিজিতের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছিলেন ?

রাস্তার মোড়ের উপরেই একটা মুদির দোকান। প্রবেশ করিতেই দোকানদার সসম্মানে অভ্যর্থনা করিল। খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা না করিয়া যখন একখানা চিঠির কাগজ ও কালি কলম চাহিয়া বসিলাম—তখন সে কিছু আশ্চর্য হইল বটে কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিল না। সেইখানে বসিয়া গৌরী তেওয়ারীর নামে একখানা পত্র লিখিয়া ফেলিলাম। ঠিকানা দিলাম বর্ধমান জেলার রাজপুর গ্রাম। জানি না সে পত্র গৌরী তেওয়ারীর কাছে পৌঁছিয়াছিল কিনা? এবং পৌঁছাইলে সে কিছু করিয়াছিল কিনা? কিন্তু ব্যাপারটা আমার মনে এমনি মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, এতদিন পরেও সমস্ত স্মরণ রহিয়াছে এবং হিন্দুসমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব আজিও যায় নাই। সে সমাজ এই দুইটি নিরুপায় ক্ষুদ্র বালিকার জন্যও স্থান করিয়া দিতে পারে নাই। যে সমাজ আপনাকে এতটুকু প্রসারিত করিবার শক্তি রাখে না সেই পঙ্গু আড়ষ্ট সমাজের জন্য মনের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব অনুভব করিতে পারিলাম না।

অনুশীলনী

১। গল্পটি তোমার নিজের কথায় বল।
২। গল্পের নামকরণ সম্বন্ধে তোমার কি মত?
৩। গৌরী তেওয়ারী কে?
৪। লেখকের মনে দুঃখ হয়েছিল কেন?
৫। কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি কি বলল?
৬। এ গল্পের করুণ দৃশ্যটা কি?



দুই বন্ধু

সুকুমার রায়

[সুকুমার রায় ঃ বাংলা শিশু সাহিত্যের অদ্বিতীয় যাদুকর সুকুমার রায় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। এঁর রচিত 'আবোল-তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলা দাশু' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি চিরস্মরণীয়। ছোটদের মাসিক 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এঁর একমাত্র পুত্র হলেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ও কিশোর সাহিত্যিক শ্রীসত্যজিৎ রায়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন।

এক ছিল মহাজন। আর এক ছিল সওদাগর। দু'জনে ভারি ভাব। একদিন মহাজন এক থলি মোহর নিয়ে তার বন্ধুকে বললে, 'ভাই ক'দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি—আমার কিছু টাকা তোমার কাছে রাখতে পারবে?' সওদাগর বললে, 'পারব না কেন? তবে কি জানো, পরের টাকা হাতে রাখা আমি পছন্দ করি না। তুমি বন্ধু মানুষ, তোমাকে আর বলার কি আছে, আমার ঐ সিন্দুকটি খুলে তুমি নিজেই এর মধ্যে তোমার টাকা রেখে দাও—আমি ও টাকা ছোঁব না।' তখন মহাজন তার থলেভরা মোহর সেই সওদাগরের সিন্ধুকের মধ্যে রেখে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি গেল।

এদিকে হয়েছে কি? বন্ধু যাবার পরেই সওদাগরের মনটা কেমন উস্‌খুস্‌ করছে। সে কেবলই ঐ টাকার কথা ভাবছে আর মনে হচ্ছে যে, বন্ধু না জানি কত কী রেখে গেছে! একবার খুলে দেখতে দোষ কি? এই ভেবে সে সিন্দুকের ভিতর উঁকি মেরে থলিটা খুলে দেখল—থলিভরা চক্‌চকে মোহর! এতগুলো মোহর দেখে সওদাগরের ভয়ানক লোভ হ'ল—সে তাড়াতাড়ি মোহরগুলো সরিয়ে তার জায়গায় কতকগুলো পয়সা ভরে থলিটাকে বন্ধ ক'রে রাখল।

দশ দিন পরে তার বন্ধু যখন ফিরে এল, তখন সওদাগর খুব হাসিমুখে তার সঙ্গে গল্প-সল্প করল, কিন্তু তার মনটা কেবলই



প্রীতিভোজ

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

[উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী : অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ময়মনসিংহের মশুয়া গ্রামের বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের অন্যতম কৃতি সন্তান। শিশু সাহিত্যের অবিস্মরণীয় লেখক। এঁর রচিত 'টুনটুনির গল্প' বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। আমাদের দেশে ছোটদের গল্পের অন্যতম আবিষ্কারক। এঁর পুত্র শিশু সাহিত্যের যাদুকর সুকুমার রায়।]

গৃহস্থের ঘরের কোণে হাঁড়ি ঝোলানো ছিল, তার ভিতরে চড়াই থাকত। একদিন চড়াই বললে, 'চড়নী আমি পিঠে খাব।'

চড়নী বললে—পিঠের জিনিসপত্র এনে দাও, পিঠে গড়ে দেব এখন। চড়াই বললে, 'কি জিনিস লাগবে?'

চড়নী বললে—'ময়দা লাগবে, গুড় লাগবে, কলা লাগবে, দুধ লাগবে, কাঠ লাগবে।'

চড়াই বললে—'আচ্ছা আমি সব এনে দিচ্ছি।' বলে সে বনের ভিতর গিয়ে, গাছের সরু-সরু শুকনো ডাল মট-মট করে ভাঙতে লাগল।

সেই বনের ভিতর এক মস্ত বাঘ ছিল, সে চড়াইকে বলত বন্ধু। ডাল ভাঙার শব্দ শুনে সে বললে, 'মট-মট করে ডাল ভাঙছে, ওকি আমার বন্ধু?'

—চড়াই বললে, 'হ্যাঁ বন্ধু।'

—বাঘ বললে, 'ডাল দিয়ে কি হবে?'

চড়াই বললে—'কাঠ চাই, চড়নী পিঠে গড়বেন।'

শুনে বাঘ বললে, 'আমি কখনো পিঠে খাইনি। আমাকে দিতে হবে।'

চড়াই বললে—তবে যোগাড় করে সব এনে দাও।

বাঘ বললে—কি কি যোগাড় চাই?

চড়াই বললে—ময়দা চাই, গুড় চাই, কলা চাই, দুধ চাই, ঘি চাই, হাঁড়ি চাই, কাঠ চাই।

বাঘ বললে—'আচ্ছা তুমি ঘরে যাও, আমি সব এনে দিচ্ছি।'

চড়াই তখন ঘরে এল, আর বাঘ দুলতে দুলতে বাজারে চলল। বাজারে গিয়ে বাঘ খালি একটিবার বললে 'হাল্লুম'। অমনি দোকানীরা 'বাবা গো। বাঘ এসেছে গো। পালা পালা!' বলে দোকান-টোকান সব ফেলে ছুটে পালাল! তখন বাঘ সব দোকান



খুঁজে ময়দা, গুড়, কলা, দুধ, ঘি, হাঁড়ি আর কাঠ নিয়ে চড়াইয়ের বাড়িতে দিয়ে এল।

তারপর চড়নী চমৎকার পিঠে গড়ল, আর দুজনে মিলে পেট ভরে খেল। শেষে বাঘের জন্য একখানা পাতায় করে কতকগুলি মাটিতে রেখে দিয়ে, দুজনে চুপ করে হাঁড়ির ভিতর বসে রইল।

বাঘ এসে পিঠে দেখতে পেয়েই খেতে বসে গেল।

একখানা পিঠে মুখে দিয়ে সে বলল, 'বাঃ—। কি চমৎকার।'

আর একখানা মুখে দিয়ে বললে—না, এটা তো ভাল নয়, খালি ময়দা দিয়ে গড়েছে।

আর একখানি মুখে দিয়ে বললে—ছি, এটাতে ভূষি আর ছাই।

আর একখানি মুখে দিয়ে বললে—উ হুঁ। এটাতে কিসের গন্ধ। গোবর দিয়েছে নাকি? চড়াই বেটা তো বড় পাজী।

এমন সময় হয়েছে কি, চড়াই হাঁড়ির ভেতর থেকে নাকমুখ সিঁটকিয়ে বলছে, 'চড়নী আমি হাঁচব?' শুনে চড়নী বললে—'চুপ চুপ। এখন হাঁচতে হবে না, তাহলে বড় মুশকিল হবে।'

চড়াই চুপ করল। কিন্তু খানিক বাদেই আবার ভয়ানক হাঁচতে গেল। চড়নী তাকে থামাতে কত চেষ্টা করল, কিছুতেই থামিয়ে রাখতে পারল না।

বাঘ একটা বিশ্রী পিঠে খেয়ে বলল 'থু! থু! এটা খালি গোবর দিয়েই গড়েছে। আর কিছু দেয়নি। যদি চড়াইয়ের নাগাল পাই, তাকে কামড়িয়ে চিবিয়ে খাব।'

তারপর আর একটা পিঠে নিয়ে মুখে দিয়ে সে সবে ওয়াক ওয়াক করতে লেগেছে, অমনি হ্যাঁচ্ছো করে চড়াই ভয়ানক শব্দে হেঁচে ফেললো। সে শব্দে বাঘ যেই চমকে লাফিয়ে উঠতে যাবে, অমনি হাঁড়ি শুদ্ধ দড়ি ছিঁড়ে চড়াই আর চড়নী তার ঘাড়ে পড়ল।

বাঘ কিছু বুঝতে পারলে না, কি বাজ পড়ল না আকাশ ভেঙে পড়ল। সে খুব ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে সেখান থেকে ছুট দিল, আর তার ঘরে না গিয়ে থামলো না।

অনুশীলনী

১। গল্পটি তোমার নিজের ভাষায় বল।
২। 'প্রীতিভোজ' কি?
৩। কে পিঠে খেতে চেয়েছিল?
৪। চড়নী কি করল?
৫। বনে কার সাথে চড়াইয়ের দেখা হল?
৬। বাঘ কি করল?
৭। বাঘ পিঠে খেয়ে কি করল?
৮। বাঘ পালিয়ে গেল কেন?



সমব্যথী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[**শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ** বাংলার সর্বজনপ্রিয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলি জেলার দেবানন্দপুরে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাঙালী জীবনের মাধুর্য ও তেজস্বিতা শরৎচন্দ্র অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তিনি কথাসাহিত্য সম্রাট রূপে আখ্যাত। তাঁর 'পথের দাবী' গ্রন্থ স্বদেশী যুগে বিপ্লবীদের প্রেরণা দিয়েছে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই অমর কথাশিল্পী দেহত্যাগ করেন।]

সেদিনটা পূর্ণিমা তিথি। গুরু-আদেশে আমরা তিনজনেই তিন দিকে ভিক্ষায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা বাড়ীর খোলা দরজার ভিতর দিয়া হঠাৎ একটি বাঙালীর মেয়ের চেহারা চোখে পড়িয়া গেল। তাহার কাপড়খানা যদিও দেশী তাঁতে বোনা গুণ চটের মতই ছিল; কিন্তু পরিবার বিশেষ ভঙ্গীটাই আমার কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছিল। ভাবিলাম পাঁচ-ছয় দিন এই গ্রামে আছি, প্রায় সব ঘরেই গিয়াছি কিন্তু বাঙালী মেয়ে ত দূরের কথা —একটা পুরুষের চেহারাও চোখে পড়ে না। সাধু-সন্ন্যাসীদের অবারিত দ্বার। ভিতরে প্রবেশ করিতেই মেয়েও আমার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখখানি আমি আজিও মনে করিতে পারি। তাহার কারণ এই যে, দশ-এগারো বৎসরের মেয়ের চোখে এমন করুণ, এমন মলিন, উদাস চাহনি আমি আর কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাহার মুখে, তাহার ঠোঁটে, তাহার চোখে, তাহার সর্বাঙ্গ দুঃখ এবং হতাশা যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। আমি একেবারেই বাংলা করিয়া বলিলাম, 'চাট্টি ভিক্ষে আনো দেখি, মা।' প্রথমটা সে কিছু বলিল না। তারপরে তার ঠোঁট দুটি বার-দুই কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল। তারপরে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি মনে মনে একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। কারণ সম্মুখে কেহ না থাকিলেও পাশের ঘর হইতে বেহারী মেয়েদের কথাবার্তা শুনা যাইতেছিল। তাহাদের কেহ হঠাৎ বাহির হইয়া এ অবস্থায় উভয়কে দেখিয়া কি ভাবিবে, কি বলিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া দাঁড়াইব, কি প্রস্থান করিব, স্থির করিবার পূর্বেই মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে এক নিঃশ্বাসে সহস্র প্রশ্ন করিয়া ফেলিল—তুমি কোথা থেকে আসছ? তুমি কোথায় থাক? তোমার বাড়ী কি বর্ধমান জেলায়? কবে সেখানে যাবে? তুমি রাজপুর জানো? সেখানকার গৌরী তেওয়ারীকে চেন?

আমি কহিলাম—'তোমার বাড়ী কি বর্ধমানের রাজপুরে?' মেয়েটি হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিল, 'হাঁ আমার বাবার নাম গৌরী তেওয়ারী, আমার দাদার নাম রামলাল তেওয়ারী। তাদের তুমি চেনো? আমি তিন মাস শ্বশুরবাড়ী এসেছি—একখানি চিঠিও পাইনে। বাবা, দাদা, মা, গিরিবালা, খোকা কেমন আছে কিছু জানিনে। ঐ যে অশ্বত্থ গাছ—ওর তলায় আমার দিদির শ্বশুরবাড়ী। ও-সোমবার দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে। এরা বলে, না—কলেরায় মরেচে।'

আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। ব্যাপার কি? এরা ত দেখচি পুরা হিন্দুস্থানী, অথচ মেয়েটি একেবারে খাঁটি বাঙালীর মেয়ে। এতদূরে এ বাটিতে এদের শ্বশুরবাড়ীটাই বা কী করিয়া হইল, আর ইহাদের স্বামী, শ্বশুর শাশুড়ীই বা এখানে কি করিতে আসিল?

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার দিদি গলায় দড়ি দিল কেন? সে কহিল, 'দিদি রাজপুরে যাবার জন্যে দিনরাত কাঁদত, খেত না শুত না। তাই তার চুল আড়ায় বেঁধে তাকে সারা দিনরাত দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। তাই দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে।'

প্রশ্ন করিলাম, 'তোমারও শ্বশুর-শাশুড়ী কি হিন্দুস্থানী?' মেয়েটি আর একবার কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, 'হাঁ। আমি তাদের কথা কিছু বুঝতে পারিনে, তাদের রান্না মুখে দিতে পারিনে, আমি ত দিনরাত কাঁদি; কিন্তু বাবা আমায় চিঠিও লেখে না, নিয়েও যায় না।' জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, তোমার বাবা এতদূরে বিয়ে

দিলেন কেন ?' মেয়েটি কহিল, 'আমরা যে তেওয়ারী। আমাদের বর ওদেশে ত পাওয়া যায় না।'

'তোমাকে কি এরা মার-ধোর করে ?'

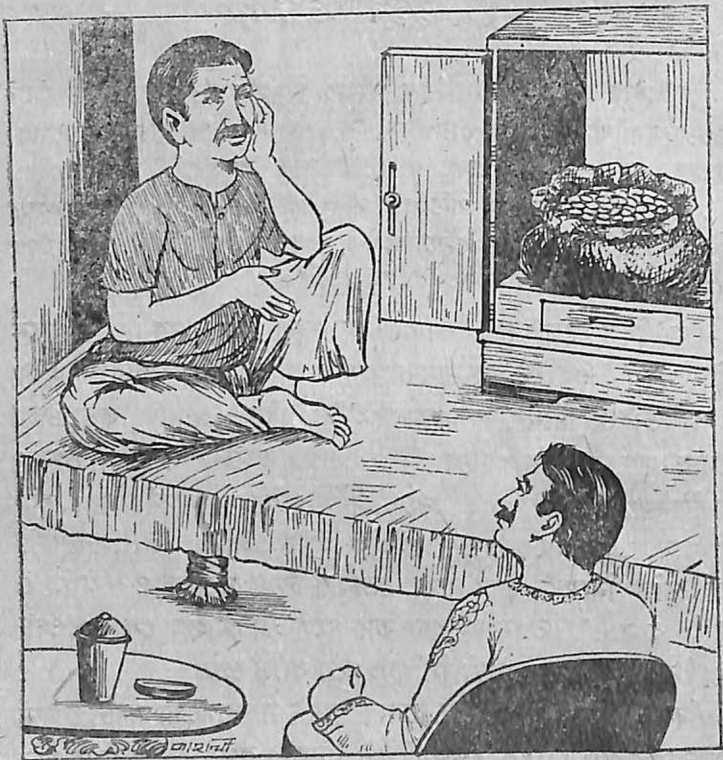
'করে না ? এই দেখ না' বলিয়া মেয়েটি বাহুতে পিঠের উপর পায়ের উপর দাগ দেখাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, আমিও দিদির মতো গলায় দড়ি দিয়ে মরব।'

তাহার কান্না দেখিয়া আমার নিজের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। আর প্রশ্নোত্তর বা ভিক্ষার অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া পড়িয়া-



ছিলাম। মেয়েটি কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিয়া বলিতে লাগিল আমার বাবাকে গিয়ে তুমি বলবে ত ? আমাকে একবার নিয়ে যেতে। নইলে আমি—বলিতে আমি কোন মতে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়াই দ্রুত বেগে অদৃশ্য হইয়া গেলাম। মেয়েটির বুক-চেরা আবেদন আমার দুই কানের মধ্যে বাজিতে লাগিল।

বলতে লাগল, "কাজটা ভালো হয়নি। বন্ধু এসে বিশ্বাস করে টাকাটা রাখল, তাকে ঠকানো উচিত হয়নি।" একথা-সেকথার পর মহাজন বললে, "তা'হলে বন্ধু, আজকে টাকাটা নিয়ে এখন উঠি—সেটা কোথায় আছে ?" সওদাগর বললে, "হ্যাঁ বন্ধু, সেটা নিয়ে যাও। তুমি যেখানে রেখেছিলে সেইখানেই পাবে—আমি থলিটা আর সরাইনি।" বন্ধু তখন সিন্দুক খুলে তার থলিটা বের ক'রে নিল।



কিন্তু, কি সর্বনাশ! থলিভরা মোহর ছিল, সব গেল কোথায় ? সব যে কেবল পয়সা! মহাজন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল!

সওদাগর বললে, "ওকি বন্ধু! মাটিতে বসে পড়লে কেন ?" বন্ধু বললে, "ভাই সর্বনাশ হয়েছে! আমার থলিভরা মোহর ছিল—এখন দেখছি একটাও মোহর নেই, কেবল কতকগুলো পয়সা!" সওদাগর বললো, "তাও কি হয় ? মোহর কখনও পয়সা হয়ে যায় ?"

সওদাগর চেষ্টা করছে এমন ভাব দেখাতে যেন সে কতই আশ্চর্য হয়েছে ; কিন্তু তার বন্ধু দেখল তার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ব্যাপারটা বুঝতে তার আর বাকি রইল না—তবু সে কোনো রকম রাগ না দেখিয়ে হেসে বললে, "আমি তো মোহর মনে করেই রেখেছিলাম—এখন দেখছি কোথাও কোনো গোল হয়ে থাকবে। যাক, যা গেছে তা গেছেই—সে ভাবনায় আর কাজ নেই।" এই বলে সে সওদাগরের কাছে বিদায় নিয়ে পয়সার থলি বাড়িতে নিয়ে গেল। সওদাগর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

দু'মাস পরে হঠাৎ একদিন মহাজন তার বন্ধুর বাড়ি এসে বললে "বন্ধু, আজ আমার বাড়িতে পিঠে হচ্ছে—বিকেলে তোমার ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিও।" বিকালবেলা সওদাগর তার ছেলেকে নিয়ে মহাজনের বাড়িতে রেখে এল, আর বললে, "সন্ধ্যার সময় এসে নিয়ে যাব।" মহাজন করল কি ছেলেটার পোশাক বদলিয়ে তাকে কোথায় লুকিয়ে রাখল—আর একটা বাঁদরকে সেই ছেলের পোশাক পরিয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দিল।

সন্ধ্যার সময় সওদাগর আসতেই তার বন্ধু এসে মুখখানা হাঁড়ির মতো করে বললে, "ভাই! একটা বড় মুশকিলে পড়েছি। তোমার ছেলেটিকে তুমি যখন দিয়ে গেলে, তখন দেখলাম দিব্যি কেমন নাদুস-নুদুস্ ফুটফুটে চেহারা—কিন্তু এখন দেখছি কি রকম হয়ে গেছে—ঠিক যেন বাঁদরের মতো দেখাচ্ছে! কি করা যায় বলতো বন্ধু?" ব্যাপার দেখে সওদাগরের তো চক্ষুস্থির! সে বললে, "কি পাগলের মতো বক্‌ছ? মানুষ কখনও বাঁদর হয়ে যায়?" মহাজন অত্যন্ত ভালো মানুষের মতো বললে, "কি জানি ভাই। আজকাল কি সব ভূতের কাণ্ড হচ্ছে, কিছু বুঝবার জো নেই। এই দেখ না সেদিন আমার সোনার মোহরগুলো খামকা বদলে সব তামার পয়সা হয়ে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার!"

তখন সওদাগর রেগে বন্ধুকে গালাগালি দিয়ে কাজির কাছে দৌড়ে গেল নালিশ করতে। কাজির হুকুমে চার-চার প্যায়দা এসে মহাজনকে পাকড়াও ক'রে কাজির সামনে হাজির করল। কাজি বললেন, "তুমি এর ছেলেকে নিয়ে কী করেছ?" শুনে চোখ দুটো গোল ক'রে মস্ত বড় হাঁ ক'রে মহাজন বললে, "আমি? আমি

মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আমি কি অত সব বুঝতে পারি ? ওর বাড়িতে মোহর রাখলাম, দশ দিনে সব পয়সা হ'য়ে গেল। আবার দেখুন ওর ছেলেটা আমার বাড়ি আসতে-না-আসতেই ল্যাজ-ট্যাজ গজিয়ে দস্তুর মতো বাঁদর হয়ে উঠেছে। কি রকম যে হচ্ছে—আমার বোধ হয় সব ভূতুড়ে কাণ্ড।" এই ব'লে সে কাজিকে লম্বা সেলাম করতে লাগল।

কাজিও চালাক লোক, ব্যাপার বুঝতে তাঁর বাকি রইল না। তিনি বললেন, "আচ্ছা তোমরা ঘরে যাও। আমি দৈবজ্ঞ ফকির ডাকিয়ে মন্ত্র পড়ে ভূত ঝাড়িয়ে সব শায়েস্তা করছি। তোমার পয়সার থলি ওর কাছে দাও—আর তোমার বাঁদর ছেলেকে এর কাছেই রাখ। কাল সকালের মধ্যে সব যদি ঠিক না হয় তবে বুঝব এতে তোমাদের কারুর শয়তানি আছে। সাবধান! তাহ'লে তোমার পয়সাও পাবে না, মোহরও পাবে না—আর তোমার ছেলে তো মরবেই, ছেলের বাপ মা খুড়ো জ্যাঠা সবসুদ্ধ মেরে সাবাড় করব।"

সওদাগর পয়সার থলি সঙ্গে নিয়ে ভাবতে-ভাবতে ঘরে চলল। মহাজন বাঁদর নিয়ে হাসতে-হাসতে বাড়ি ফিরল। ভোর-না-হতেই সওদাগর থলির মধ্যে আবার মোহর ভ'রে মহাজনের বাড়ি গিয়ে বলছে, "বন্ধু! বন্ধু! কি আশ্চর্য দেখে যাও! তোমার পয়সাগুলো আবার সব মোহর হয়েছে।" মহাজন বললে, "তাই নাকি? কি আশ্চর্য, এদিকে সেই বাঁদরটাও আবার তোমার খোকা হয়ে গেছে।" তারপর মোহরের থলি নিয়ে সওদাগরের ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিয়ে মহাজন বললে, "দেখ্ জোচ্চোর! ফের যদি আমায় 'বন্ধু' 'বন্ধু' বলবি তো মেরে তোর থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে দেব।"

অনুশীলনী

১। 'দুই বন্ধু' গল্পটি তোমার নিজের কথায় বল।
২। গল্পের নামকরণের সার্থকতা কি?।
৩। মহাজন কাকে বলে? সে কি বললে?
৪। সওদাগর কাকে বলে?
৫। সওদাগরের লোভ হল কেন?
৬। মহাজন ফিরে এসে কি বলল?
৭। সওদাগর তার কথায় কি বোঝাল?
৮। কাজির বিচারে কি হল?
৯। দুই বন্ধুর মধ্যে কে সৎ?
১০। গল্পের শেষে কি দেখা গেল? কে বেশী লোভী?



সিদ্ধার্থের জন্ম

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শিল্পীশ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শিল্পী হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ পৃথিবী বিখ্যাত। সাহিত্য রচনাতেও তাঁর ক্ষমতা অসাধারণ। নানক, ক্ষীরের পুতুল, রাজ কাহিনী প্রভৃতি তাঁর রচনা। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন।]

কপিলাবাস্তুর রাজবাড়ী। রাজরানী মায়াদেবী সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছেন। ঘরের সামনে খোলা ছাদ, তার ওধারে বাগান, শহর, মন্দির, মঠ। আরও ওধারে—অনেক দূরে হিমালয় পর্বত—সাদা বরফে ঢাকা। পাহাড়ের ওপরে আকাশ জুড়ে আশ্চর্য এক সাদা আলো, তার মাঝে সিঁদুরের টিপের মত সূর্য উঠছেন। রাজা শুদ্ধোদন এই আশ্চর্য আলোর দিকে চেয়ে আছেন। এমন সময় মায়াদেবী জেগে উঠে বলছেন, 'মহারাজ, কি চমৎকার স্বপ্নই দেখলাম। এতটুকু একটি শ্বেতহস্তী, দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো বাঁকা-বাঁকা কচি দুটি দাঁত, সে যেন হিমালয়ের ওপার থেকে মেঘের ওপর দিয়ে আমার কোলে নেমে এল, তারপর যে কোথায় গেল আর দেখতে পেলাম না। আহা, কপালে তার সিঁদুরের টিপের মত একটি টিপ ছিল।'

রাজরানী স্বপ্নের কথা বলাবলি করছেন, ইতিমধ্যে সকাল হয়েছে, রাজবাড়ীর নহবতখানায় বাঁশি বাজছে, রাস্তা দিয়ে লোকজন চলাফেরা করছে, মন্দির থেকে শাঁখঘণ্টার শব্দ আসছে, অন্দরমহলে রাজদাসীরা সোনার কলসীতে মায়াদেবীর চানের জল তুলে আনছে, মালিনীরা সোনার থালায় পূজোর ফুল গুছিয়ে রাখছে, খাবারের জন্যে দাসীদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিলে, ভিখারী এসে 'জয়

রানীমা' বলে দরজায় দাঁড়াল। দেখতে-দেখতে বেলা হল, রাজবাড়ীতে রানীর স্বপ্নের কথা নিয়ে সকলে বলাবলি করতে লাগল।

কপালের রক্তচন্দনের তিলক, মাথায় মানিকের মুকুট, পরনে লাল চেলী, সকালের সূর্যের মতো রাজা শুদ্ধোদন সিংহাসন আলো করে বসেছেন। পাশে মন্ত্রীবর, তার পাশে দণ্ডধর, সোনার ছড়ি হাতে ওপাশে ছত্রধর শ্বেতছত্তর খুলে, তার ওপাশে নগরপাল ঢাল খাঁড়া নিয়ে। একদিকে দেশ-বিদেশের রাজা আর রাজপুত্তুর। রাজসভা ঘিরে দেশের প্রজা, তাদের ঘিরে যত দুয়ারী—মোটা রায়বাঁশের লাঠি হাতে। রাজসভার ঠিক মাঝখানে লাল চাঁদোয়ার নীচে আটখানি রক্তকম্বলের আসন, তারি ওপরে পুঁথি খুলে রানীর স্বপ্নের কথা গণনা করতে বসেছেন।

'মহারাজা, শ্বেতহস্তীর স্বপ্নে জীবন দুঃখকারী মহাজ্ঞানী পুত্রলাভ। নিশ্চয় মহারাজ, এবার এক রাজপুরুষ এই শাক্যবংশে অবতীর্ণ হবেন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হয় না। আনন্দ কর।'

চারদিকে অমনি রব উঠল, 'আনন্দ কর, আনন্দ কর। অন্নদান কর, বস্ত্রদান কর, দীপদান, ধূপদান, ভূমিদান কর!' কপিলাবস্তুতে রাজার ঘরে প্রজার ঘরে আনন্দের বাজনা বেজে উঠল, আকাশ আনন্দে হাসতে লাগল, বাতাস আনন্দে বইতে লাগল।

ক্রমে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। সুরূপা যত পাড়ার মেয়ে রাজবাড়ির পদ্মপুকুরে গা ধুয়ে উঠে এল। উবু ঝুঁটি, গলায় কাঠি, একদল মালি-মালিনী শুক্নো পাতা ঝাঁট দিতে-দিতে ফুলের গাছে জল দিতে-দিতে বেলা শেষে বাগানের কাজ সেরে চলে গেল। সবুজ ঘাসে, পুকুর পাড়ে, গাছের তলায়—কোনো খানে কোনো কোণে একটু ধুলো, একটি কুটোও রেখে গেল না।

রাত আসছে—বসন্তকালের পূর্ণিমা রাত। পশ্চিমে সূর্য ডুবছেন, পূর্বে চাঁদ উঠি-উঠি করছেন। পৃথিবীর এক পারে সোনার শিখা, আর এক পারে রূপোর রেখা দেখা যাচ্ছে, মাথার ওপর নীল আকাশ লক্ষ-কোটি তারায় আর সন্ধি-পূজায় শাঁখ-ঘণ্টায় ভরে উঠেছে। এমন সময় মায়াদেবী রূপোর জাল ঘেরা সোনার

পাল্‌কিতে সহচরী সঙ্গে বাগানে বেড়াতে এলেন, রানীকে ঘিরে রাজদাসী যত ফুলের মালা, পানের বাটা নিয়ে। প্রিয় সখীর হাতে হাত রেখে, চলতে চলতে রানী এসে বাগানের মাঝে প্রকাণ্ড সেই শালগাছের তলায় দাঁড়ালেন। অমনি সন্ধ্যা হল, পাখিরা একবার কলরব করে উঠল, বাতাসে ফুলের গন্ধ, আকাশের তারার আলো ছড়িয়ে পড়ল। পূর্বে, পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হলেন—শালগাছটির



ওপর যেন একটি সোনার ছাতা। ঠিক সেই সময়ে বুদ্ধদেব জন্ম নিলেন—যেন একটি সোনার পুতুল, চাঁপাফুলে ঘেরা পৃথিবীতে যেন আর এক চাঁদ। চারদিকে আলোয় আলো হয়ে গেল—কোনোখানে আর অন্ধকার রইল না। মায়া মায়ের কোলে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন। পৃথিবীর বুক জুড়িয়ে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন,

যেন পদ্মফুলের ওপর এক ফোঁটা শিশির—নির্মল, সুন্দর, এতটুকু। দেখতে দেখতে লুম্বিনী বাগান লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠল। পাত্র-মিত্র-অনুচর-সভাসদ সঙ্গে রাজা শুদ্ধোদন রাজপুত্রকে দেখতে এলেন। দাসদাসীরা মিলে শাঁখ বাজাতে লাগল, উলু দিতে লাগল।

স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, আকাশে মেঘে মেঘে দেবতার দুন্দুভি বাজছে, মর্ত্যের ঘরে ঘরে শাঁখ-ঘণ্টা, পাতালের তলে-তলে জগঝম্প জয়ডঙ্কা বেজে উঠেছে। বুদ্ধদেব তিনলোক জোড়া তুমুল আনন্দের মাঝখানে জন্ম নিয়ে পৃথিবীর ওপরে প্রথম সাত পা হেঁটে চলে গেলেন। সুন্দর পা দুখানি যেখানে যেখানে পড়ল সেখানে সেখানে অতল, সুতল, রসাতল ভেদ করে এক একটি সোনার পদ্ম, আগুনের চরকার মতো মাটির ওপরে ফুটে উঠল; আর স্বর্গ থেকে সাতখানি মেঘ এসে সাত-সমুদ্রের জল এনে সেই সাতটি পদ্মের ওপর ঝির্‌ঝির্‌ করে ঢালতে লাগল।

অনুশীলনী

১। গল্পটি তোমার নিজের কথায় বল।
২। 'সিদ্ধার্থের জন্ম' বলতে কি বোঝায়?
৩। বুদ্ধদেবের নাম সিদ্ধার্থ হল কেন?
৪। বুদ্ধদেবের বাবা ও মায়ের কি নাম?
৫। বুদ্ধদেব কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
৬। কপিলাবস্তু কোথায় অবস্থিত?
৭। বুদ্ধদেবের আর কি কি নাম জানো?
৮। মহারানী কি স্বপ্ন দেখেছিলেন?
৯। স্বর্গ থেকে কি হয়েছিল?
১০। গল্পের মূল বক্তব্য কি?



দুষ্ট বিড়াল

সুখলতা রাও

[সুখলতা রাও ঃ বাংলা কিশোর ও শিশু সাহিত্যের ইনি একজন স্বনামধন্য লেখিকা। বিখ্যাত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা। এঁর রচিত ছোটদের গল্পগুলি শিক্ষণীয় হিসাবে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'গল্প আর গল্প'।]

এক বিড়াল ছিল, আর কেউ ছিল না। একদিন সে মনে মনে ভাবল একলা এত ঘরের কাজ করতে ভাল লাগে না একটা চাকর রাখা যাক।

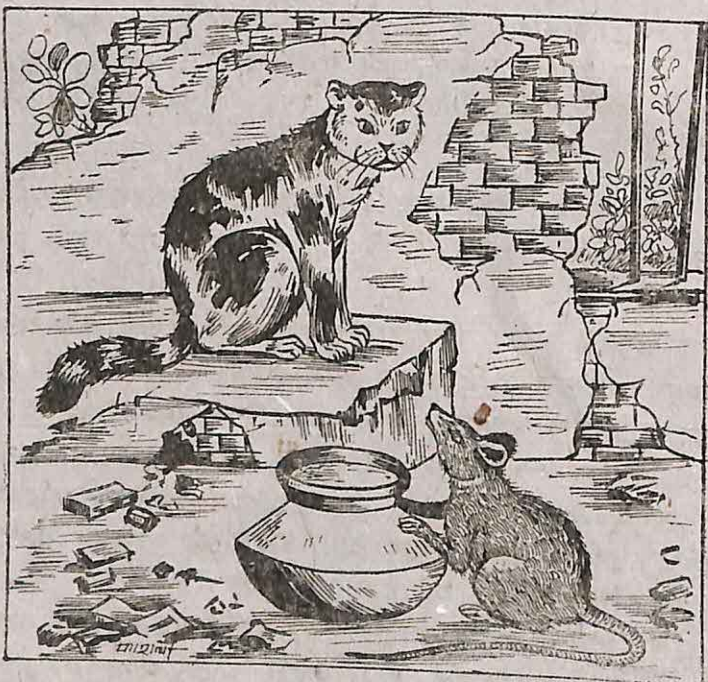
এইভেবে সে এক ইঁদুরকে গিয়ে বললে, 'দেখ ভাই, তুমি আমার বন্ধু।' ইঁদুর ত একেবারে ভয়ে জড়সড়। সে প্রাণের দায়ে তাড়াতাড়ি সায় দিল, 'হ্যাঁ।' তারপর বেড়াল বলে বসল, 'আমরা দুই বন্ধুতে একটা বাড়ি করে থাকি না কেন? তোমারও খরচ বাঁচবে আমারও খরচ বাঁচবে। তুমি রান্না-বান্না করবে, ঘর পরিষ্কার করবে। আমি বাজার করব আর টাকাকড়ির হিসাব রাখব।' ইঁদুর কাঁপতে কাঁপতে 'হ্যাঁ' বলে রাজী হল।

তাই দুজনে এক পোড়ো বাড়িতে বাসা নিয়েছে। বেড়াল বললে ইঁদুরকে, 'বন্ধু তোমার কি টাকাকড়ি আছে, আমার হাতে দাও দেখি—আমি ত হিসাব রাখব।' ইঁদুরের না বলবার জো নেই। সে তাড়াতাড়ি তার সব টাকা এনে দিল বিড়ালকে। ইঁদুর বেচারা সমস্ত কাজ করে বেড়াল সারাদিন নাক ডাকিয়ে ঘুমায়। কেবল দিনের মধ্যে একবার ইঁদুরের পয়সা নিয়ে বাজার করতে যায়; আর যা কিছু কেনে, তার অর্ধেকের বেশী পথেই খেয়ে শেষ করে ফেলে। এমনি করে তাদের দিন কাটে। শীত কাছে এলে, বেড়াল বললে, 'বন্ধু, শীতকাল ত আসছে। শীতের দিনে তুমি খাবার

Date 24.11.06
Acc. No. 12304

খুঁজতে বেরুলে ঠাণ্ডা লেগে তোমার অসুখ করবে। আগে থাকতে কিছু খাবার কিনে এক জায়গায় লুকিয়ে রাখলে হয় না? শীতের আগে আমরা সে খাবার ছোঁব না।'

ইঁদুর খুশী হয়ে সায় দিল, 'হাঁ হাঁ, বেশ কথা।' পরদিন বাজার থেকে বেড়াল এক হাঁড়ি ঘি কিনে এনেছে। এখন সে ঘি রাখে কোথায়? তাদের বাসার কিছু দূরে জমিদারবাবুদের ঠাকুরবাড়ী।



সেখান থেকে কেউ কোন জিনিস চুরি করতে সাহস পাবে না। ইঁদুর আর বেড়াল পরামর্শ করে তারি পূজার দালানে এক অন্ধকার খুপরির ভিতর ঘি-এর হাঁড়ি লুকিয়ে রেখে এল।

একদিন যায়, দুদিন যায়, বেড়ালের খালি সেই ঘি-এর হাঁড়ির কথা মনে পড়ে। তিন দিনের দিন আর সে লোভ সামলাতে না পেরে ইঁদুরকে গিয়ে বললে, 'আজ আমার নেমন্তন্ন। আমার পিসতুতো ভাই-এর নামকরণ হবে। তুমি ঘরের কাজকর্ম কর,

আমি নামকরণটা একটু দেখে আসি।' বলে বেড়াল আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ল।

সোজাসুজি ঠাকুরবাড়ী গেলে পাছে ইঁদুর টের পায় তাই সে বেরুল ঠিক তার উল্টো পথে। শেষে ঘুরে ফিরে এল কিন্তু সেই ঠাকুরবাড়ীতে। বেড়াল ঘি খাচ্ছে আর বলছে, 'ঘি খেতে খুব ভাল। কিন্তু চুরি করে ঘি খেতে যেমন ভাল তেমন আর কিছু নয়।' ওপরের ঘিটুকু চেটে খেয়ে মুখ মুছে বেড়াল ঠাকুর দালানের ছাদেই ঘুমিয়ে রইল।

বেলা বাড়তেই বাড়ী ফিরতেই ইঁদুর? জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভাই কেমন নেমন্তন্ন খেলে? কি নাম হল?'

বেড়াল উত্তর দিল, 'ওঃ খুব খাইয়েছে। নাম হল 'এক চাটান।'

ইঁদুর বললে, এক চাটান? সে আবার কি রকম নাম। বেড়াল খালি বললে, হুঁ উঁ উঁ।

আবার কদিন যায়; বেড়ালের আবার ঘি খাবার জন্য মন ছটফট করতে থাকে। কাজেই আর একদিন সে ইঁদুরকে বললে, আজ আমার বোনপোর নামকরণের নেমন্তন্ন।

এবারে হাঁড়ির অর্ধেক খালি করে তারপর ছাদের ওপর সারাদিন ঘুমিয়ে, সন্ধ্যার পর বাড়ীতে এল। সেদিনও ইঁদুর জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন খেলে? কি নাম হ'ল?' বেড়াল তাতে উত্তর দিল, 'নাম হ'ল আধা-আধি। আহা ছানাটি কি সুন্দর! সাদা ধপধপে যেন দুধের ফেনা।'

অবাক হয়ে ইঁদুর ভাবে 'আধা-আধি আবার কি? এ রকম নাম ত কখনও শুনিনি!'

অর্ধেক ঘি শেষ হয়েছে, বাকি অর্ধেকটুকুর জন্য বেড়ালের জিব দিয়ে জল পড়ছে কাজেই রাত্রে বেড়াল ঘুমুতে পারছে না। তাই আবার একদিন এক ভাগনীর নামকরণের ছুতো করে বেড়াল সেই ঠাকুর দালানের খুপরিতে গিয়ে হাজির হল। তারপর দেখতে দেখতে ঘি-এর হাঁড়ি শেষ। খেয়েদেয়ে পেট ঢাক করে, বেড়াল সেই খুপরির ভেতরই ঘুমিয়ে রইল।

বেলা গেল, বেড়াল বাড়ী এলে ইঁদুর যখন জিজ্ঞাসা করল, বিড়াল বলল, 'এবারে খুব ভাল নাম হয়েছে—চাঁছা-পোঁছা।'

শুনে ইঁদুরের ভারি সন্দেহ হয়েছে, চাঁছা-পোঁছা? চাঁছা-পোঁছা? এ রকম আবার নাম হয় নাকি? কখনো ত শুনিনি!—চাঁছা-পোঁছা?

দেখতে দেখতে শেষে শীতকাল এসে উপস্থিত! ঠাণ্ডায় বাইরে বেরোনো যায় না, খাবার যোগাড় করা মুশকিল। তখন ইঁদুর আর বেড়াল সেই ঘি-এর হাঁড়ি আনতে ঠাকুরবাড়ী চলল। ইঁদুর ভাবছে 'ভাগ্যিস ঘি কিনে রেখেছিলাম।' বেড়াল ভাবছে, 'দেখা যাক কি হয়।'

ঢাকনি খুলে ইঁদুর যখন দেখল হাঁড়ি একেবারে খালি, তখন তার কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। সে বেড়ালের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর বললে, বুঝেছি। এক চাটান, আধা-আধি, চাঁছা-পোঁছা তখনি আমার সন্দেহ হয়েছে! আমি চললাম। আমার টাকা ফিরিয়ে দাও।

বেড়াল অমনি তার গালে এক থাপ্পড় দিয়ে বললে, 'এই নে।' দুষ্ট লোকের সঙ্গে কখনো ভাব করতে নেই।

অনুশীলনী

১। গল্পটি তোমার নিজের কথায় বল।
২। 'দুষ্ট বিড়াল' বলা হল কেন?
৩। বিড়াল ইঁদুরকে কি বলল?
৪। ইঁদুর রাজী হল কেন?
৫। ইঁদুর কি করত?
৬। বিড়াল কি করত?
৭। বিড়াল বাজার থেকে কি এনেছিল?
৮। দুষ্টু লোকের সঙ্গে ভাব করতে নেই কেন?



ধর্ম পরীক্ষা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

[**তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ** স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক ও গল্প রচয়িতা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র-জীবনেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। বাংলা উপন্যাস ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের পর তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

এক ব্রাহ্মণ ছিলেন মহাকর্মী, মহাপুণ্যবান। জ্যোতির্ময় ললাট, সৌভাগ্য-লক্ষ্মী স্বয়ং ললাট মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিটি কর্মই ছিল মহৎ এবং প্রতি কর্মেই ছিল সাফল্য; কারণ যশোলক্ষ্মী আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁর কর্মশক্তিতে। তাঁর কুল ছিল অকলঙ্ক। পুত্র-কন্যা-বধূর গৌরবে অকলঙ্ক কুল উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল—কারণ কুললক্ষ্মী তাঁর কুলকে আশ্রয় করেছিলেন। পাপ অহরহ ঈর্ষাতুর; অন্তরে ব্রাহ্মণের বাসভূমির চারদিকে অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার সহ্য হয় না। বহু চিন্তা করে সে একদিন আনল অলক্ষ্মীকে। বাড়ির বাইরে থেকে ব্রাহ্মণকে ডাকল। ব্রাহ্মণ বললেন—কি চাও বল?

পাপ বলল—আমি বড় দুর্ভাগ্য। দুঃখ-কষ্টের সীমা নেই। আমার সঙ্গিনীটিকে আপনি কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিন, এই আমার প্রার্থনা।

ব্রাহ্মণ বললেন—আমি গৃহস্থ; আশ্রয়প্রার্থী দুঃস্থকে আশ্রয় দেওয়া আমার ধর্ম! বেশ, থাকুন উনি। বধূ কন্যার মতই যত্ন করব। ইচ্ছা হলে যতদিন দুর্ভাগ্যের শেষ না হয়, ততদিন তুমিও থাকতে পার। এস, তুমিও এস।

আহ্বান সত্ত্বেও পাপ কিন্তু পুন প্রবেশ করতে সাহস করল না। কারণ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করে রয়েছেন ধর্ম।

যাক, অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিপর্যয় ঘটল। ফলবান বৃক্ষগুলির ফল নীরস হয়ে গেল। ফুল ম্লান হল।

রাত্রে ব্রাহ্মণ জপ করছেন—তখন শুনতে পেলেন এক করুণ কান্না। কেউ যেন করুণ সুরে কাঁদছে। বিস্মিত হয়ে জপ শেষ করে উঠতেই তিনি দেখলেন—তাঁরই ললাট থেকে বেরিয়ে এল এক জ্যোতি, সেই জ্যোতি ক্রমে এক নারীমূর্তি ধারণ করল। তিনিই এতক্ষণ কাঁদছিলেন। ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করলেন—কে মা তুমি? রমণীমূর্তি বললেন আমি তোমার সৌভাগ্যলক্ষ্মী। এতদিন তোমার ললাটে আশ্রয় করেছিলাম, আজ তোমায় ছেড়ে যেতে হচ্ছে, তাই কাঁদছি।

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—একটা প্রশ্ন করব, মা। আমার অপরাধ কি হ'ল?

—তুমি আজ অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছ। ওই মেয়েটি অলক্ষ্মী। অলক্ষ্মী এবং আমি তো একসঙ্গে থাকতে পারি না।

ব্রাহ্মণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রণাম করলেন, কিন্তু কোন কথা বললেন না। তিনি চলে গেলেন।

পরদিন সকালে দেখলেন, বৃক্ষের ফল খসে গেছে, ফুল শুকিয়ে গেছে, সরোবর হয়েছে ছিদ্রময়ী। জল ছিদ্রপথে অদৃশ্য হয়েছে। ভূমি হয়েছে শস্যহীনা, গাভী হয়েছে দুগ্ধহীনা, গৃহ হয়েছে শ্রীহীন।

রাত্রে আবার সেইরকম কান্না। আবার দেহের থেকে বেরিয়ে এলেন এক দিব্যাঙ্গনা। তিনি বললেন—আমি তোমার যশোলক্ষ্মী। অলক্ষ্মীকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ, ভাগ্যলক্ষ্মী তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন, সুতরাং আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করে যাচ্ছি।

ব্রাহ্মণ নীরবে প্রণাম করলেন। তিনিও চলে গেলেন।

পরদিন তিনি শুনলেন—লোকে তাঁর অপযশ ঘোষণা করছে, তিনি প্রতিবাদ করলেন না।

সেদিন রাত্রে আর-এক নারীমূর্তি তাঁর দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি কুললক্ষ্মী। বললেন—অলক্ষ্মী এসেছে, ভাগ্যলক্ষ্মী চলে গেছেন, যশোলক্ষ্মী চলে গেছেন, লোকে তোমার কলঙ্ক রটনা করছে; আমি কুললক্ষ্মী, আর কেমন করে থাকি তোমাকে আশ্রয় করে? তিনিও চলে গেলেন।

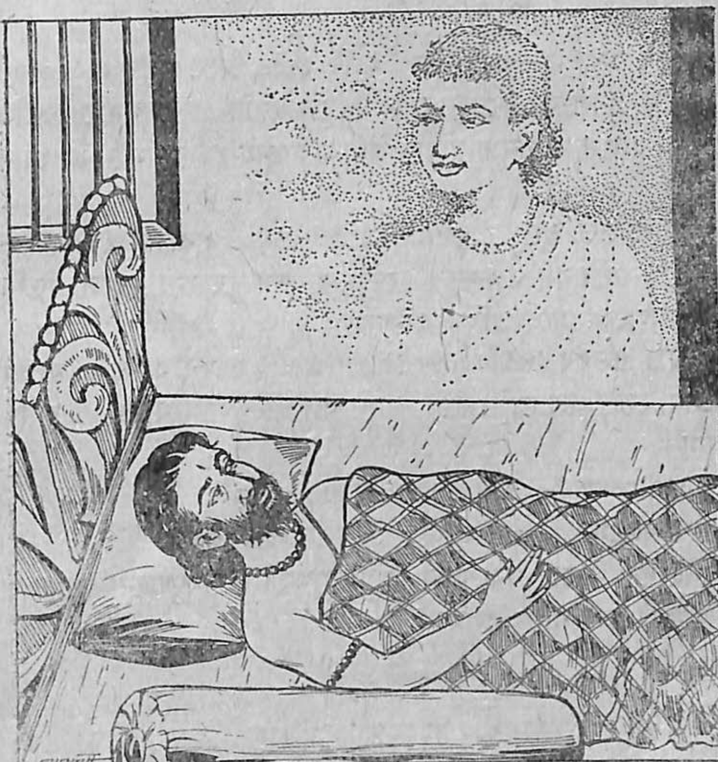
পরদিন ব্রাহ্মণের দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন আর এক মূর্তি।

নারী নয়—পুরুষ মূর্তি। দিব্য ভীমকান্তি, জ্যোতির্ময় পুরুষ। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে?

দিব্যকান্তি পুরুষ বললেন—আমি ধর্ম।

—ধর্ম! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করছেন কোন্ অপরাধে?

—অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছ তুমি।



—সে কি আমি অধর্ম করেছি?

ধর্ম চিন্তা করে বললেন—না।

—তবে?

—ভাগ্যলক্ষ্মী তোমায় ত্যাগ করেছেন।

—আশ্রয়প্রার্থী বিপদগ্রস্তকে যখন আশ্রয় দেওয়া অধর্ম নয়, তখন আমার অধর্মের জন্য তিনি আমায় পরিত্যাগ করেননি। পরিত্যাগ করেছেন অলক্ষ্মীর সংস্পর্শ সইতে না পেরে।

—হ্যাঁ।

—ভাগ্যলক্ষ্মীকে অনুসরণ করেছেন যশোলক্ষ্মী। তার পেছনে গেছেন কুললক্ষ্মী, আমি প্রতিবাদ করিনি। কারণ ওই তাঁদের পন্হা। একের পেছনে এক আসেন, আবার যাবার সময় একের পেছনে অন্যে যান। কিন্তু আপনি আমাকে পরিত্যাগ করবেন কোন্ অপরাধে?

ধর্ম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ব্রাহ্মণ বললেন—আপনাকে আমি যেতে দিতে পারি না; কারণ আপনাকে অবলম্বন করেই আমি বেঁচে রয়েছি। আপনাকে আমি যেতে না বললে আপনার যাবার অধিকার নেই। আমিই আপনার অস্তিত্ব।

ধর্ম স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, নিজের ভ্রম বুঝলেন। তারপর ব্রাহ্মণকে বললেন—তথাস্তু। তোমার জয় হোক। বলে, তিনি আবার ব্রাহ্মণের দেহে প্রবিষ্ট হলেন।

ধর্মের প্রভাবে সেইদিন রাত্রে উঠল আবার ক্রন্দন ধ্বনি। ব্রাহ্মণ দেখলেন, সেই অলক্ষ্মী মেয়েটি এসে বলছে—আমি যাচ্ছি। আমি চললাম।

ব্রাহ্মণ বললেন—তুমি স্বেচ্ছায় বিদায় চাও?

—স্বেচ্ছায়, স্বেচ্ছায় যাচ্ছি। সে মিলিয়ে গেল।

সেইদিন রাত্রে ফিরলেন ভাগ্যলক্ষ্মী। ফিরলেন তারপর যশোলক্ষ্মী, তারপর কুললক্ষ্মী।

অনুশীলনী

১। 'ধর্ম পরীক্ষা' বলতে কি বোঝায়?
২। এ গল্পের নামকরণ সম্বন্ধে তোমার কি মত?
৩। 'অলক্ষ্মী' কি?
৪। ব্রাহ্মণ অলক্ষ্মীকে রাখলেন কেন?
৫। অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দেবার জন্য কে বলেছিল?
৬। সৌভাগ্যলক্ষ্মী কি বললেন?
৭। ধর্ম চলে যেতে চাইলে ব্রাহ্মণ তাঁকে কি বললেন?
৮। কি ভাবে ভাগ্যলক্ষ্মী, যশোলক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী ফিরে এলো?
৯। 'জ্যোতির্ময়' বলতে কি বোঝায়?
১০। গল্পের মূল বক্তব্য কি তা তোমার নিজের কথায় বল।



[**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ** সর্বজনপ্রিয় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হালিশহরের নিকটবর্তী মুরারিপুর গ্রামে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। তিনি কিছুকাল ভাগলপুরের একটি জমিদারী এস্টেটে চাকরি করেন। সেখানে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থ রচিত হয়। অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে অপরাজিতা, ইচ্ছামতী, আরণ্যক প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।]

সকালবেলা। আটটা কি নয়টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে। এমন সময় তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিলে অপু ও—অপু—সে এতক্ষণ বাড়ি ছিল না কোথা হইতে এইমাত্র আসিল। তাহার স্বর একটু সতর্ক মিশ্রিত।

অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল বলিল—কিরে?

দুর্গার হাতে একটা নারকেলের মালা সেটা নিচু করিয়া দেখাইল কতকগুলি কাঁচ আমকাটা। সুর নিচু করিয়া বলিল—মা ঘাট থেকে আসেনি তো?

অপু মাথা নাড়িয়া বলিল—উঁহু।

দুর্গা চুপি চুপি বলিল—একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস্? আমের কুসি জরাবো—

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল—তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মারবে যে। আমার কাপড় যে বাসি।

তুই যা না শীগ্‌গির করে, আসতে এখন ঢের দেরি—ক্ষার

কাচতে গিয়েছে—শীগ্‌গির যা—তেল-টেল যেন মেঝেতে ঢালিসনে—

অপু বাড়ির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল, বলিল—নে হাত পাত।

—তুই অতগুলো খাবি দিদি?



—অতগুলো বুঝি হোল? আচ্ছা নে আর দুখানা—বাঃ দেখতে বেশ হয়েছে রে—একটা লঙ্কা আনতে পারিস?

—লঙ্কা কি করে পাড়বো দিদি। মা যে তক্তার ওপর রেখে দ্যায়—আমি যে নাগাল পাইনে।

—তবে থাগ্‌গে থাক—

খিড়কির দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শোনা গেল—দুগ্‌গা ও দুগ্‌গা—

মায়ের ডাক কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দেবার সুযোগ নাই, মুখ ভর্তি। সে তাড়াতাড়ি জরালো আমের চাকলাগুলি খাইতে লাগিল। পরে এখনও অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠাল গাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইল সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতেছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই।....দুর্গা খালি মালাটা একটান মারিয়া জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—মুখটা মুছে ফ্যালো না বাঁদর—নুন লেগে রয়েছে যে। পরে দুর্গা নিরীহ মুখে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কি মা ?

—কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি ? একলা নিজে কতদিকে যাবো ? অতবড় মেয়ে সংসারের কুটো গাছটা ভেঙে দুখানা করা নেই কেবল পাড়ায় টো-টো করে টোকলা সেধে বেড়াচ্ছেন—সে বাঁদর কোথায় গেল ?

অপু আসিয়া বলিল—মা খিদে পেয়েচে।

—তোমাদের রাতদিন খিদে, আর রাতদিনই ফাইফরমাস ও দুর্গা দ্যাখতো বাছুরটা ডাক পাড়ছে কেন ?

খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়ে শশা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আর এটু আটা বের করো না মা, মুখে বড্ড লাগে।

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সংকুচিত সুরে বলিল, চালভাজা আর নেই মা ?

অপু খাইতে খাইতে বলিল—উঃ চিবানো যায় না, আম খেয়ে যা দাঁত টকে—দুর্গার ভ্রূকুটি মিশ্রিত চোখ টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধ পথেই বন্ধ হইয়া গেল।

তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল—আম কোথায় পেলি.... ? সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল....তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি ?

দুর্গা বিষন্নমুখে বলিল....ওকে জিজ্ঞাসা করো না ? আমি এই তো দাওয়ায় দাঁড়িয়ে—যখন ডাকলে তখন তো ?—স্বর্ণ

গোহালিনী গাই দুহিতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল, মা ডেকে ডেকে সারা হোল।

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তাহার পিঠে দুম করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল—আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে। আর কোনদিন আম দেবো—ছাই দেবো—হাবা একটা কোথাকার.... ?

অনুশীলনী

১। গল্পটি নিজের কথায় বল।
২। গল্পটির নাম আমের কুসি হল কেন ?
৩। অপু কে ?
৪। দুর্গা কে ?
৫। সর্বজয়া সম্বন্ধে কি জান ?
৬। অপু কি বলল ?
৭। দুর্গা মায়ের ডাকে সাড়া দিল না কেন ?
৮। কে বলেছিল মুখটা মুছে ফেল ?
৯। অপু কি বলেছিল ?
১০। দুর্গা রাগ করেছিল কেন ?



পরের জন্য জীবন দান

বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়

[**বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ঃ** বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দ্বারভাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। এঁর রচিত 'রানুর প্রথম ভাগ', 'বরযাত্রী', 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোকগমন করেন।]

রাস্তায় লোক জমিয়া গিয়াছে, ভয়ানক ভীড়।

'ব্যাপার কি?' বলিয়া উৎসুক ভাবে এক যুবক সেদিকে আগাইয়া গেল।

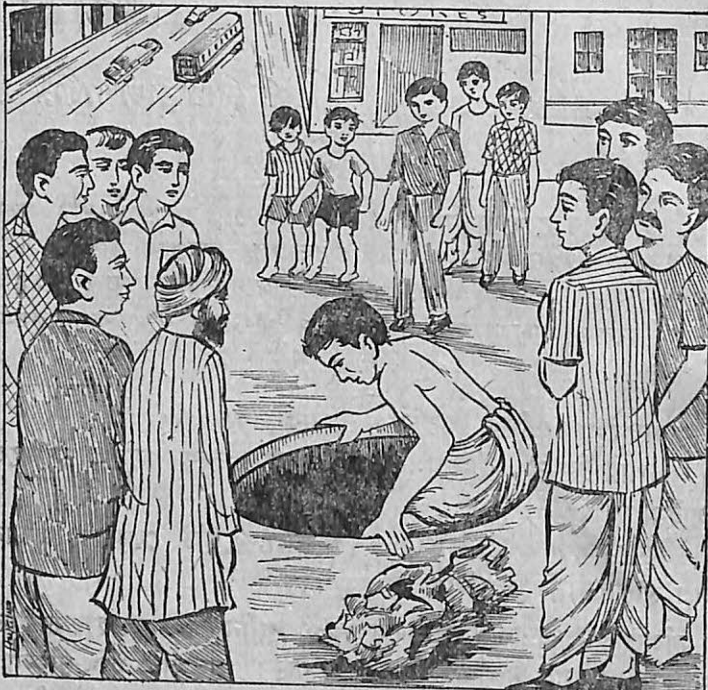
ভীড় ঠেলিয়া সম্মুখে গিয়া সে শুনিল, দুইটি মেথরের জীবন বিপন্ন তাহারা মরিতে বসিয়াছে।

কলিকাতার রাস্তার মাঝে মাঝে এক-একখানি গোল লোহার চাকতি দেখা যায়। সেই চাকতিগুলি খুব বড়। নর্দমার মুখ-ঢাকনা। শহরের ময়লা সেই নর্দমা দিয়া বহুদূরে চলিয়া যায়। কিন্তু নর্দমার মুখগুলি মাঝে মাঝে পরিষ্কার করিতে হয়, নতুবা নর্দমা-গুলিতে ময়লা জমিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে।

যুবকটি শুনিল, মেথর দুইজন সেই রকম একটি নর্দমা পরিষ্কার করিতে নীচে নামিয়াছিল। কিন্তু ময়লার নর্দমায় কোন কোন সময় আগে হইতেই এক রকম দূষিত গ্যাস জমিয়া থাকে। ঐ দূষিত গ্যাসের মধ্যে পড়িলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। মেথর দুইটি সেদিন সেইরূপ গ্যাসের মধ্যে পড়িয়া মৃতপ্রায়। লোক জমিয়াছে কিন্তু হতভাগ্য ঐ দুইটি ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। সকলেই কেবল হৈ চৈ চেঁচামেচি করিতেছিল—"পুলিশ ডাক, ডাক্তার ডাক" ইত্যাদি।

য‍ুবক আর থাকিতে পারিল না ; সে ব‍ুঝিল, প্রত্যেকটি ম‍ুহ‍ূর্তে ঐ দ‍ুইটি ব্যক্তির অবস্থা ক্রমে মন্দ হইতেছে।

সে তাড়াতাড়ি নিজের গায়ের জামা খ‍ুলিয়া ফেলিল। তারপর চোখের পলকে নর্দমায় নামিয়া পড়িল।



গভীর নর্দমা। সেখানে ভীষণ অন্ধকার। তাহার মধ্যে লোক দ‍ুইটি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। তাহারা কোথায় আছে। য‍ুবক প্রথমেই তাহা স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে হাতড়াইয়া অতি কষ্টে সে তাহাদের সন্ধান পাইল।

লোক দ‍ুইটির দেহ তখন অসাড় নিস্পন্দ। কিন্তু য‍ুবক তাহাদের নাকের কাছে হাত লইয়া ব‍ুঝিল, তাহারা তখনও জীবিত। উহারা শ‍ুধ‍ু অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে।

জীবিত হইলেও উহাদের ম‍ৃত্যু আসন্ন। আর কিছ‍ু পরেই হয়তো তাহাদের শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদিগকে তুলিবার উপায় কি। দড়ি বা সেই রকম একটা কিছ‍ু

পাইলে তাহা বাহিয়া সে হয়তো লোক দুইটিকে লইয়া উপরে উঠিতে পারে। কিন্তু দড়ি কই ?

যুবক চীৎকার করিয়া বলিল—"একটা দড়ি ঝুলিয়ে দিন।"

উপরে তখন ভীষণ কলরব। কে কাহার কথা শোনে! যুবক কত চীৎকার করিল কিন্তু কেহই তাহার কথা শুনিতে পাইল না।

নর্দমার দূষিত গ্যাস ততক্ষণে যুবককে পাইয়া বসিয়াছে। তাহার বুক যেন চাপিয়া আসিল, তাহার শ্বাসকষ্ট হইতে লাগিল। কখনও বসিয়া কখনও দাঁড়াইয়া সে ছটফট করিতে লাগিল।

সে অনুভব করিল, তাহার পায়ের তলায় দুটি অসাড় দেহ। আর আশেপাশে অন্ধকার দুর্গন্ধময় দেওয়াল। কিন্তু তাহার মাথার উপরে মাত্র কয়েক হাত উঁচুতেই কত আলো, কত বাতাস। পৃথিবীর লোকজন তখনও সেখানে কত কলরব করিতেছে।

ঈশ্বরের দেওয়া আলো-বাতাসের একটি কণামাত্র পাইবার জন্য যুবকের তখন কত আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু হায়! সেখানেই তাহার শেষ হইল। যুবক আর বাহিরে আসিতে পারিল না। বিষাক্ত গ্যাস তাহাকেও আক্রমণ করিল। তাহারও হাত-পা অসাড় হইয়া আসিল। তারপর কখন যে সে ঐ দুই হতভাগ্যের পাশেই লুটাইয়া পড়িল, তাহা কে জানে!

এইভাবে পরের জীবন বাঁচাইতে গিয়া একটি সাহসী যুবক তাহার নিজের জীবন দান করিল। এই যুবক এক সামান্য কেরানী কিন্তু পরের জন্য হীন প্রাণ বলি দিল।

এই সাহসী যুবকের নাম নফরচন্দ্র কুণ্ডু। তিনি মারা গিয়াছেন অনেকদিন।

কিন্তু বাঙালী আজিও তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই। কলিকাতার ভবানীপুরে আজিও তাঁহার নামে একটি রাস্তা ও স্মৃতিস্তম্ভ বর্তমান আছে।

অনুশীলনী

১। কাহিনীটি তোমার নিজের কথায় বল।
২। এ গল্পের নামকরণের সার্থকতা কি ?
৩। 'পরের জন্য জীবনদান' এ কথার অর্থ কি ?
৪। রাস্তায় কেন লোক জমেছিল ?
৫। কেন লোকে তাকে ভুলতে পারে না ?
৬। সাহসী যুবকের নাম কি ?
৭। কোথায় এ ঘটনা ঘটেছিল ?



[বনফুল ঃ প্রবীণ কথাশিল্পী । প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় । ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন । ইনি একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন । এঁর রচিত ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । ১৯৭৯ সালে ইনি দেহত্যাগ করেন ।]

এক

দুই বন্ধু যখন নদীতীরে এসে দাঁড়াল, তখন খেয়ার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে । খেয়া চলে গেছে অনেকক্ষণ । বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইল তারা নদীর দিকে । পার হতেই হবে যেমন করে হোক, কালই শেষ দিন । অনেক কষ্টে অনেক সুপারিশ যোগাড় করে মেডিকেল কলেজে ঢোকবার অনুমতি পেয়েছে তারা । কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, কালই ভরতি হবার শেষ দিন । কাল যদি তারা পেঁছিতে না পারে, তাদের জায়গায় অপর ছেলে নেওয়া হবে । উমেশ ও নবীন দুজনেরই বাড়ি পাড়াগাঁয়ে, রেললাইন থেকে বেশ দূর । কয়েক ক্রোশ হেঁটে নদী পার হয়ে তবে ট্রেনে চড়তে হয় । বাড়িতে টাকার যোগাড় করতে এসেছিল তারা । অতগুলো টাকা চট্ করে যোগাড় হয়ে ওঠেনি । দেরি হয়ে গেছে ।

উমেশ জিজ্ঞাসা করলে, সাঁতার জানিস তুই ?

নবীন । না ।

উমেশ । আমিও জানি না, মহা মুশকিল হল ত ।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুজনে । কাল সকালের আগে খেয়া নৌকো নেই । সেই নৌকোয় গেলে ট্রেন ধরা যাবে না । নদীর ওপর ঝুঁকে পড়েছিল একটা বটগাছ কিছু দূরে ।

তার দিকে চেয়ে উমেশের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল হঠাৎ। আশার আনন্দে চোখের দৃষ্টি ঝলমল করে উঠল।

উমেশ। ওই গাছটার নীচে একটা ডিঙি বাঁধা আছে রে!

নবীন। হ্যাঁ আছে, তা কার ডিঙি?

উমেশ। চল, খোঁজ করা যাক।

এগিয়ে গেল দুজনেই। মাঝি বললে, কোন এক দারোগা সাহেবের জন্য পাঠিয়েছেন ওপারের এক জমিদার।



উমেশ বুদ্ধিমান ছেলে। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়।

উমেশ। চিনিস তুই সে দারোগা সাহেবকে?

মাঝি। না হুজুর।

উমেশ। আমিই সেই দারোগা সাহেব। চল্।

তড়াক করে লাফ দিয়ে নৌকোয় উঠে বসল উমেশ। নবীন কিন্তু উঠল না, দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

উমেশ। আয়, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

নবীন। না, আমি যাব না।

উমেশ। কেন ?

নবীন। আমি ত দারোগা সাহেব নই।

উমেশ। দারোগা সাহেবের সঙ্গী ত বটে। আয়।

নবীন। না, আমি যাব না।

উমেশের ভয় হচ্ছিল, বেশি দেরি করলে আসল দারোগা না এসে পড়ে। সব ভেস্তে যাবে তাহলে। আরও দু-চারবার অনুরোধ করে উমেশ একাই শেষে চলে গেল। নবীনের গোঁয়ার-তুমির জন্য নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারে না সে। নৌকো যখন মাঝ-নদীতে তখনও একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, অচল প্রস্তরমূর্তিবৎ নবীন তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

দুই

পঁচিশ বছর কেটে গেছে।

সেই নদীতীরে এক অন্ধকার রাত্রে আবার এসে দাঁড়াল উমেশ। এখন আর সে উমেশ নেই। এখন সে মেজর ইউ. সি. চ্যান্ডা। পরিধানে খাঁকী মিলিটারী পোশাক। বাড়ি থেকে জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটি নিয়ে এসেছে সে। একমাত্র ছেলে টাইফয়েডে মুমূর্ষু।

সেদিনও পারের খেয়া ছেড়ে চলে গেছে। টর্চ ফেলে ফেলে সেদিনও সে হঠাৎ দেখতে পেলো, একটা ছোট নৌকো একধারে বাঁধা রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে বললে, এই, কার নৌকো ?

একটি জীর্ণ-শীর্ণ গোছের লোক ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। বললে, আমার নৌকো।

পার করে দিবি ?

—না। শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলে লোকটি। কিছুদিন আগেই তাদের গ্রামে মিলিটারী 'রেড' হয়ে গেছে। খাঁকী পোশাক দেখলেই সমস্ত মন কণ্টকিত হয়ে ওঠে তার। ভয়ে নয়, ঘৃণায়।

—যাবি না কেন ?

—আমার অন্য কাজ আছে।

—ভাড়া দেব। যা ভাড়া চাস দেব।

—না, আমি যেতে পারব না।

পাঁচ-দশ-বিশ-পঞ্চাশ-একশ টাকা পর্যন্ত দিতে চাইলে উমেশ। লোকটা অবিচলিত। কিছুতেই যাবে না সে। ধৈর্যচ্যুতি ঘটল উমেশের। বললে, আমি মিলিটারীর লোক, জানিস?

লোকটা নিরুত্তর।

—ইচ্ছে করলে তোকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পারি, জানিস।

শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে লোকটা উত্তর দিলে, আমি কিছুতেই যাব না।

—দেখি, তুই কেমন না যাস। উমেশ ঠিক করে ফেলল থানায় গিয়ে স্বয়ং দারোগাকে নিয়ে এসে ত্যাদড় লোকটাকে যেতে বাধ্য করবে সে। থানা কিন্তু নদীর ঘাট থেকে এক ক্রোশ দূরে। তা হোক, তবু যাবে সে। গট্‌গট্ করে অন্ধকারে এগিয়ে গেল সে থানার দিকে।

একটু পরে অন্ধকার নদীতীরে আর একজন এসে দাঁড়াল। শুধু পা, পরনে হাঁটু পর্যন্ত ওঠানো খদ্দরের কাপড়, গায়ে ফতুয়া। নবীন। তাকেও ওপারে যেতে হবে। কিন্তু খেয়া চলে গেছে। ছোটো নৌকোর মাঝিটি যেন তারই জন্য অপেক্ষা করছিল।

—দাদাঠাকুর এলে নাকি?

নবীন এগিয়ে এল। বললে, কে? আরে বিশু যে! হঠাৎ এখানে?

—আমি ওপারে মাছ ধরতে এসেছিলাম, দাদাঠাকুর। মধুর কাছে শুনেছিলাম, তুমি ওপারে গেছ সালিসির বৈঠকে। আমার সামনেই খেয়ার নৌকোটা গেল বেরিয়ে। ভাবলাম, একটু অপেক্ষা করে যাই! দাদাঠাকুর যদি এসে পড়েন, ফাঁপরে পড়ে যাবেন এই রাত্তিরে।

—তা বেশ করেছিস্! চল।

—জানো দাদাঠাকুর, এই একটু আগে এক ব্যাটা মিলিটারী এসে খুব হম্বিতম্বি শুরু করেছিল।

গল্পটা বলতে বলতে নৌকো ছেড়ে দিল। নবীন ডাক্তার হতে পারেনি। হয়েছিল দেশসেবক।

অনুশীলনী

১। গল্পটি তোমার নিজের ভাষায় বল।
২। এ গল্পের নাম 'দুই খেয়া' হল কেন ?
৩। গল্পটিতে কোন্ সময়ের কথা বলা হয়েছে ?
৪। খেয়া আর নৌকোর তফাত কি ?
৫। ডাক্তার উমেশ বড় না দেশসেবক নবীন বড় ?
৬। 'মহা মুশকিল হল ত' কোন্ মুশকিলের কথা বলা হয়েছে ?
৭। 'দেখি, তুই কেমন না যাস' কে কাকে এরূপ বলেছিল ?
৮। কাকে দাদাঠাকুর বলা হয়েছে ?
৯। দাদাঠাকুর কি করতেন ?
১০। গল্পের বিষয়বস্তুর সারকথা কি ?



সভাকবি

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

[শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : ইনি ১৯০১ সালে বীরভূমের রূপমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যে ময়না কুঠির উপর গল্প লিখে ইনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবেও তাঁর দান অসামান্য। ১৯৬৯ সালে পরলোকগমন করেন।]

এক যে ছিল রাজা। রাজার মস্ত বড় রাজত্ব। যেমন নাম তার তেমনি প্রতিপত্তি। রাজার কাজ নেই, কর্ম নেই, সারাটা দিন শুধু বসে বসে খায় আর ঘুমায়। দিন তার যেন কিছুতেই কাটতে চায় না—কি আর করে, মানুষের একটা নেশা তো চাই। অনেক ভেবে-চিন্তে রাজা এক মজার নেশা ধরলে। কবিতা লেখার নেশা।

দিনে বিশ্রাম নেই, রাত্রে ঘুম নেই, শুধু দেখা যায় সাদা কাগজের ওপর খস্‌খস্‌ করে রাজাবাহাদুর কলম চালাচ্ছে আর কবিতা লিখছে।

কিন্তু কবিতা লেখা বড় সহজ নয়; দিনের পর দিন ভেবে ভেবে রাজার মাথা গেল খারাপ হয়ে। দিনরাত কেমন যেন উন্মনা ভাব, ডাকলে সাড়া দেয় না, ভাল করে কথা বলে না।

রাণী একদিন জিজ্ঞাসা করলে, "কি কর ওসব?"

রাজা বললে, "কবিতা লিখি।"

রাণী বললে, "কই শুনি তোমার কবিতা?"

রাজা একটি একটি করে কবিতা পড়ে আর রাণীর মুখের পানে তাকায়।

রাণী বললে, "চমৎকার!"

রাজার খুশীর আর সীমা নেই। পাঁচ নম্বর কবিতাটি ছিল একটুখানি বড়। রাজা সেটি পড়ে শেষ করে রাণীর মুখের পানে তাকাতেই দেখে রাণী ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাজা একটুখানি হাসলো! হেসে কবিতার খাতাটি দিলো বন্ধ করে। রাজা বোকা ছিলো না। বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। কবিতার খাতা সেই যে বন্ধ করলো, একটি দিনের তরেও সেটি খোলেনি। পাত্র, মিত্র, সভাসদ—সবাই অবাক।

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে, "কবিতার নেশা কি কেটে গেল মহারাজ?"

রাজা বললে, "হ্যাঁ। কবিতার নেশা বড় সাংঘাতিক নেশা, মন্ত্রী। এ-নেশা সকলের ধাতে সহ্য হয় না।"

তারপর হঠাৎ একদিন মাথায় কি খেয়াল চাপলো, মন্ত্রীকে ডেকে বললে, "রাজ্যে প্রচার করে দিন—যে লোক সবচেয়ে ভাল কবিতা লিখতে পারবে, তাকে আমার সভাকবি করব।"

সংবাদটা যেই প্রচারিত হওয়া—ব্যাস, তার পরের দিন থেকে গাদা গাদা কবিতা আসতে লাগলো রাজার দরবারে। কবি আর কবিতার দায়ে মন্ত্রীর অবস্থা হলো ঠিক পাগলের মত।

মন্ত্রী রাজাকে গিয়ে বললে, "কবিতার আমি কিছু বুঝি না, রাজা। বিচারের ভার আপনি গ্রহণ করুন।"

রাজা এতদিন পরে আবার একটি কাজের মত কাজ পেলো। পর্বত প্রমাণ কবিতার স্তূপ একটি একটি করে পড়তে লাগলো।

অধিকাংশই বাজে। মাত্র পঁচিশটি কবিতা মনে হলো যেন কবিতার নেশায় মশগুল হয়ে লেখা। এই পঁচিশজন কবিকে ডেকে পাঠানো হলো।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে পঁচিশজন কবি রাজার দরবারে এসে হাজির। সকলেই এলো রাজার সভাকবি হবার আশায়। কিন্তু রাজার বিচার শুনে তাদের চক্ষুস্থির।

কাজ নেই বাবা সভাকবি। তারা তখন পালাতে পারলে বাঁচে। রাজার হুকুমে রাজবাড়ীর সদর ফটক গেল বন্ধ হয়ে। প্রহরীরা তাদের যেতে দিল না।

রাজা বললে, "এই পঁচিশজন কবিকে কয়েদখানায় বন্ধ করে

রাখো। দিনে মাত্র একবার করে খেতে দাও, আর প্রত্যেককে বলে দাও কবিতা যেন তারা আর না লেখে।"

রাজার আদেশ।



কি আর করবে। সেইদিন থেকে এই দুর্ভাগা পঁচিশজন কবি নিরতিশয় নির্যাতন সহ্য করে কয়েদখানায় বন্দী হয়ে রইলো।

একমাস পরে রাজা নিজে গেল তাদের দেখতে। দেখলে তাদের দুর্দশার একশেষ। অনাহারে, অনিদ্রায়, আর দুর্ভাবনায় প্রত্যেকের শরীর হয়েছে শীর্ণ কঙ্কালসার। দেখলে আর সহজে চিনতে পারা যায় না।

অনুসন্ধান করে দেখা গেল, পঁচিশজন কবির মধ্যে মাত্র তিনজন রাজার আদেশ অমান্য করে লুকিয়ে কবিতা লিখছে। ধরা যারা পড়লো তারা ভেবেই অস্থির। আবার কি শাস্তি হয় কে জানে?

রাজা বললে, "এই তিনজন কবিকে ধরে রাখো, বাকি বাইশ-জনকে দাও ছেড়ে।"

বাইশজন কবি ছাড়া পেয়ে বেঁচে গেল। বাড়ী গিয়ে কিন্তু দেখে, রাজা অবিচার করেনি, তাদের বাড়ীতে রীতিমত টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে।

এদিকে যে তিনজন কবিকে ধরে রাখা হয়েছে, রাজা বললে, "ডাকো তাদের।"

রাজা এই তিনজনকে ডেকে তিনখানা বাড়ী দিলো, প্রচুর অর্থ দিলো। বললে, "দেশ থেকে, স্ত্রী-পুত্র এনে পরম আনন্দে তোমরা এইখানে বাস কর। কিন্তু একটা কথা, কবিতা আর তোমরা লিখতে পারবে না। তাদের পশ্চাতে রইল রাজার গুপ্তচর। কবিতা লিখলেই শাস্তি তাদের অনিবার্য। আর কেনই বা কবিতা লিখবে? প্রচুর ঐশ্বর্য লাভ করে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে যারা বাস করছে, অন্তরের এই ক্ষণিক বিলাসে তাদের কি-ই বা প্রয়োজন। কবিতা লেখা বোধহয় তারা ছেড়েই দিলে। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার, এই তিনজনের মধ্যে একজন হঠাৎ একদিন ধরা পড়লো। নিতান্ত সঙ্গোপনে সে নাকি আবার কবিতা লিখছে।

কবি বললে, "হ্যাঁ রাজা। আপনার দেওয়া ঐশ্বর্য আপনি ফিরিয়ে নিন। কবিতা লিখতে না পারলে আমি মরে যাব।"

রাজার মুখে হাসি ফুটলো। বললে, "ডাকো মন্ত্রীকে।"

মন্ত্রী এলো। রাজা বললে, "এতদিন পরে আমার কবিতার বিচার শেষ হলো মন্ত্রী। ইনিই আমার সভাকবি।"

কবি জিজ্ঞাসা করলে, "আমাকে কি করতে হবে রাজা?"

রাজা বললে, "মনের আনন্দে আজ থেকে আপনি কবিতা লিখবেন।"

অনুশীলনী

১। 'সভাকবি' কাকে বলে? এ গল্পের নাম সভাকবি হল কেন?
২। সভাকবি গল্পটি নিজের ভাষায় বল।
৩। সভাকবি গল্পটি পড়ে কি শিক্ষালাভ করেছ?
৪। কবি আর সভাকবির তফাত কি?
৫। 'কি কর ওসব'—এ কার কথা?
৬। 'কবিতার নেশা কি কেটে গেল মহারাজ?' —কে একথা বলেছিলেন?
৭। কোন্ তিনজন কবিকে ধরে রাখা হয়েছিল?



সেদিনের সেই ঘটনা

এস্ ওয়াজেদ আলি

[এস. ওয়াজেদ আলি : ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিখ্যাত প্রাবন্ধিক ছিলেন। এঁর লেখা 'ভবিষ্যতের বাঙালী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোকগমন করেন।]

সেদিনটা ছিল শনিবার।

স্কুল থেকে বাড়ী ফিরলাম। দুপুরের পর থেকেই চারদিকের আবহাওয়াটা ঘোলাটে হয়ে উঠল। যত বিকেল হতে থাকল, চারদিকের গুমোটভাব বেড়ে উঠল। চারদিক যেন থমথম করছে। আমি বুঝতে পারলাম না আজ একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটবে।

আমি এবং মা বাবা ঘরের মধ্যে বসে আছি। মা গল্প বলছেন। তখন আকাশে ধূসর রঙ-এর মেঘ, কেবল পশ্চিম-উত্তর আকাশে একখণ্ড নিবিড় কৃষ্ণ মেঘ আস্তে আস্তে সূর্যকে আড়াল করে দিচ্ছে। আমার মনে হল যেন সূর্য ভয় পেয়ে আড়ালে লুকোচ্ছে। আকাশ, মাটি, গাছপালা, সব যেন নীরব, নিথর, নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। সবাই ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে আছে। সবাইয়ের মনে তখন একটা অজানা আতঙ্কের ভাব।

হঠাৎ শুনতে পেলাম কেমন যেন একটা গোঁ গোঁ শব্দ। মনে হচ্ছে এর থেকে, কে যেন ক্রোধে তীব্র উত্তেজনায় ছুটে আসছে। আমার প্রথম প্রথম ঐ শব্দে একটুও ভয় লাগছিল না। বরং ঐ শব্দ আমার বেশ ভালই লাগছিল। এদিকে বাড়ীর অন্যান্যরা দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দিয়েছে। এরই মধ্যে গাছপালা আকাশ-বাতাস সব মাতাল হয়ে উঠল। মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট রাক্ষসী উন্মত্ত ক্রোধে তাণ্ডব নৃত্য করে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-এর কড় কড় শব্দ এবং মেঘে ঝলসানো তীব্র আলোক ছটা। চারদিক ধুলোয় ভরে গেছে। আর বৃষ্টি হচ্ছে তুমুল শব্দে। বাইরে সত্যি প্রলয় চলেছে।

এই ভাবে সারা রাত ঝড় বৃষ্টি চলল। এরই মধ্যে আমি যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি তা আমি নিজেই জানি না। ভোর বেলায় উঠে দেখি আকাশ নির্মেঘ। সোনালী আলোতে চারদিক ঝকমক করছে।

রবিবার আমার ছুটির দিন। আমি মাকে বলে বাইরে গেলাম। চারদিকে কত ঘর আর বাড়ি ভেঙে পড়েছে। রাস্তায় এক হাঁটু কাদা। আমি চারদিকের দৃশ্য দেখতে লাগলাম আর এগিয়ে চললাম। রাস্তায় কত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।



চলতে চলতে হঠাৎ একটা শব্দ আমার কানে এল। কিসের শব্দ! সেখানেই আমি থমকে দাঁড়ালাম। শব্দটা কোথা থেকে আসছে আমি ঠিক ঠাওর করতে পারছিলাম না। আমি আরো

এগিয়ে চললাম দেখলাম পূবে একটা কুঁড়েঘর। মনে হল কে যেন আর্তনাদ করে কাঁদছে। দেখলাম কুঁড়েঘরটা ভেঙে পড়েছে। আমি কোন রকমে ঐ ভাঙা কুঁড়েঘরের মধ্যে ঢুকলাম। কিন্তু ঢুকে এক আশ্চর্য জিনিস দেখলাম, দেখলাম একটা ছোট্ট শিশু ও তার মাকে। তাদের মরমর অবস্থা। আমি তাদের দু'জনকে কোন রকমে টেনে বাইরে নিয়ে এলাম। সেখানে কোন জনবসতি নেই। আমি কি করব ভাবতে পারছিলাম না। শিশুটির মা ২।১ মিনিটের মধ্যে মারা গেলেন। এখন ক্ষত-বিক্ষত শিশুটি কোন রকমে বেঁচে আছে।

আমি খুব তাড়াতাড়ি ঐ অবস্থায় শিশুটিকে বাড়ীতে নিয়ে এলাম। তখন মা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমি তখুনি শিশুটির মাথায় জল ঢালতে আরম্ভ করলাম তারপর শিশুটির জ্ঞান ফিরলে তাকে কিছু খেতে দিলাম।

কিন্তু শিশুটির মাকে বাঁচাতে পারলাম না। তখন আমি মাকে সব কথা বললাম। মা শুনে খুব খুশী হলেন। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যদি আজ সকালে না বেরুতাম তাহলে, শিশুটিরও মায়ের মতো মৃত্যু হত।

সেই থেকেই শিশুটি আমাদের বাড়ীতে থাকে। আমাদের ভাইয়ের মতো। আমরা তাকে খুব যত্ন করি—যদিও সে এখন খুব বড় হয়ে গিয়েছে। অবশ্য আমিও বড় হয়েছি। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাল্যের অনেক স্মৃতি আমার মন থেকে মুছে গেছে। কিন্তু এ স্মৃতি তো ভুলবার নয়। এ আমার চিরদিন মনে থাকবে।

অনুশীলনী

১। গল্পটি নিজের কথায় বল।
২। এ গল্পে কোন্ ঘটনা বলা হয়েছে?
৩। স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে এসে কে কি দেখতে পেল?
৪। প্রলয় কি ভাবে এসেছিল?
৫। ছুটির দিনে কে কাকে রক্ষা করল?
৬। সব শুনে মা খুশি হলেন কেন?
৭। শিশুটি কি ভাবে বড় হতে লাগল?
৮। 'ভাইয়ের মতো' কে থাকে?
৯। 'এ স্মৃতি তো ভুলবার নয়'—এ কথার অর্থ কি?
১০। গল্পের মাধ্যমে কি শিক্ষা পেলে?



আগডুম বাগডুম

সুনির্মল বসু

[**সুনির্মল বসু ঃ** সুনির্মল বসুর জন্ম ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের গিরিডিতে। তাঁকে শিশু সাহিত্যের সব্যসাচী বলা হয়। গল্প, কবিতা, ছড়া ও নাটকে তিনি ছিলেন শিশুদের অতিশয় প্রিয় লেখক। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই ছানাবড়া, বেড়েমজা, হৈচৈ, বরণডালা প্রভৃতি। ১৯৫৭ সালে এঁর মৃত্যু হয়।]

আজগুবিপুরে ছিল নামজাদা চোর—নাম ছিল তার আগডুম। কত লোককে যে সে ঠকিয়েছে তার আর শেষ নেই।

একদিন আগডুম বাজারে চলল গুড় বেচতে। হঠাৎ আজবনগরের মোড়ে আর একটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হল। তার পিঠে দড়ি দিয়ে একটা তরোয়াল বাঁধা।

আগডুম বললে—"তুমি কে ভাই ?"

লোকটি বললে—"আমি বাগডুম। তোমার নাম কী ? বাড়ি কোথায় ?"

আগডুম উত্তর দিলে—"আমার নাম আগডুম, বাড়ি আমার আজগুবিপুরে। গুড় বেচতে বাজারে চলেছি।"

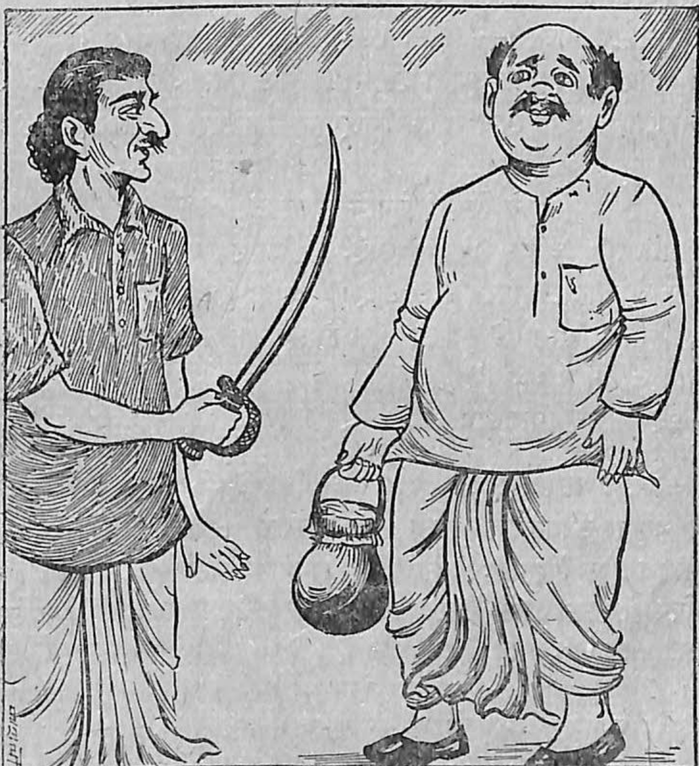
বাগডুম বললে—"ভাই, আমি এই তরোয়ালটা বেচতে চলেছি। এটা আমার নিজের হাতে তৈরি খুব ভালো আর মজবুত। অনেক টাকা এর দাম।"

আগডুম বললে—"ভাই, তুমি আমার এই গুড়ের হাঁড়িটা নাও আর আমাকে তরোয়ালটা দাও। আমার পাড়ায় ভয়ানক চোরের উৎপাত।"

বাগডুম বললে—"বেশ, আমাদের পাড়াতেও ভালো গুড়ের খুব অভাব।"

তারপর দু'জনে দুটি জিনিস অদলবদল করে নিয়ে গেল।

বাড়ি গিয়ে বাগডুম খানিকটা গুড় তুলে দেখল—ইস্, হাঁড়িতে পচা গোবর ঠাসা! নাকে কাপড় দিয়ে পালাতে হয়। ওপরে শুধু কিছু ভালো গুড়। আগডুম তো তাকে আচ্ছা ঠকিয়েছে।



এদিকে আগডুম বাড়ি ফিরে এসে ভারি খুশি হয়ে যেই তরোয়াল খুলল, অমনি দেখে, ভিতরে তরোয়াল-টরোয়াল কিছুই নেই, একটা সরু লিকলিকে কাঠি।

দু'জনেই ভেবেছিল দু'জনকে বেশ ঠকিয়েছে।

আগডুম আজগুবিপুরের চোর আর বাগডুম আজবনগরের ঠগ্। বাগডুমের কাছে ঠকে গিয়ে আগডুম প্রতিজ্ঞা করল, তাকে ঠকাতেই হবে।

একদিন শীতকালে বিকেলবেলা আগডুম কিছু পচা ডিম নিয়ে বাগডুমের বাড়ি হাজির হল।

"বাগডুম, বাড়ি আছ হে ?"

আগডুমের গলা চিনতে পেরে বাগডুম বললে—"আরে এসো এসো ভাই আগডুম। সেই তোমার টাটকা গুড় দিয়ে এমন চমৎকার পিঠে করে খেয়েছিলাম যে কী বলব ভাই! এত পেট ঠেসে সেই পিঠে খেয়েছিলাম যে অসুখ হয়ে গেছে।"

আগডুম বললে—"ভাই, তোমার তৈরি তরোয়াল এত চমৎকার আর ধারালো যে তার তুলনা হয় না। যত চোর আর ঠগ সব ঐ তরোয়ালের ভয়ে দেশ ছেড়ে পিট্‌টান দিয়েছে। যাই হোক ভাই, আজ মানস সরোবরের দুধ-হাঁসের টাটকা তাজা ডিম এনেছি—কিছু রাখো। এমন ডিম ত্রিভুবনে মেলা ভার!"

বাগডুম বললে—"বেশ ভাই, আমি ডিম বড্ড ভালবাসি, তুমি সব ডিমই আমাকে দিয়ে দাও ভাই। অসুখে ভুগছি, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছি না। ঐ কোণের থলেটায় টাকা আছে, তোমার ডিমের যা দাম তা নিয়ে যাও।"

এই বলেই বাগডুম কাঁথা গায়ে দিয়ে হি হি করে কাঁপতে লাগল।

এদিকে ঘরের কোণে থলি-টলি কিছুই ছিল না। ছিল এক খুব বড়ো ভীমরুলের চাক। অন্ধকারে টাকার থলি ভেবে যেই আগডুম হাত দিয়েছে, আর যায় কোথায়, বড়ো বড়ো ভীমরুল চারদিক থেকে এসে তাকে এমন কামড় দিতে লাগল যে আগডুম প্রাণের দায়ে একেবারে পগার পার।

অনুশীলনী

১। গল্পটি তোমার নিজের কথায় বল।
২। গল্পের নাম 'আগডুম বাগডুম' হল কেন ?
৩। আগডুম বাগডুম কে ছিল ?
৪। আগডুম আর বাগডুম প্রথম দু'জনেই দু'জনকে কি ভাবে ঠকিয়েছিল ?
৫। আগডুম আবার কি ভাবে বাগডুমকে ঠকাতে গেল ?
৬। শেষে আগডুমের পরিণাম কি হল ?
৭। আগডুম বাগডুম গল্প পড়ে তোমরা কি বুঝতে পারলে ?
৮। এই গল্পটির মূল বক্তব্য কি ?
৯। লেখকের সম্বন্ধে কি জান ?
১০। সুনির্মল বসুর কয়েকখানা বইয়ের নাম বল।



[মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঃ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক। এঁর রচিত চন্দ্রনাথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইনি অনেক শিক্ষামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন।]

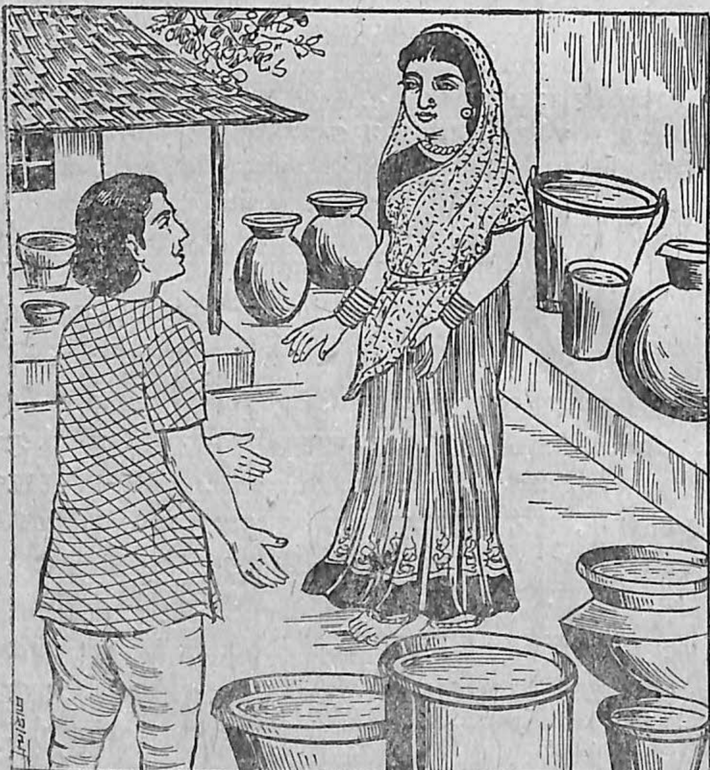
এক যে ছিল গেরস্থ। সে বিয়ে করেছিল এক মরুদেশে। সে দেশে না আছে সবুজ ঘাস, না আছে শ্যামল গাছপালা, না আছে আকাশে মেঘ, না আছে মাটিতে রস। সে দেশে না আছে নদী আর তার কুলুকুলু নাদ, না আছে পাখী আর তার কলকল রব।

বিয়ের পর বৌ পয়লা গৃহস্থের বাড়িতে এল। এসে কতদিন সে মুখে লম্বা ঘোমটা দিয়ে লাজে লজ্জাবতী লতাটির মতন হয়ে রইল। বৌ চোখ বুজে কেবল কোণে বসে থাকে। বৌ চোখে কিছু দেখে না, কানে কিছু শোনে না। সকল সময় কেমন একটা ভয় ভয়। সকল সময় কেমন একটা জড়োসড়ো ভাব।

ক্রমে তার সরম ভেঙে গেল। তখন বৌ চোখ মেলে দেখলে—বাঃ, এদেশের মাটির ওপর কেমন ঘাসের ওপর নরম মখমল! জমির ওপর কেমন ছোট-বড় ছাতা! নীল আকাশের কোলে কেমন মেঘের পেঁজা তুলো! পাখীগুলো গান গেয়ে কেমন হাওয়ার ওপর সাঁতার দিয়ে বেড়ায়।

একদিন পাড়ার মেয়েরা কলসী কাঁখে করে তাকে এসে বললে, "আয় না বৌ জল আনতে যাই।" তার বাপের বাড়ির দেশে জল আনতে যেত পুরুষ মানুষে, উট নিয়ে, ঘোড়া নিয়ে, কতদূর থেকে। এখানের মেয়েরা জল আনতে যায় পায়ে হেঁটে। সে ত ভেবেই অস্থির। মেয়েরা তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

গৃহস্থের বাড়ির পিছনে একখানা ক্ষেত পার হয়ে অশ্বত্থগাছের নীচে নদী। এত জল! কাকের চোখের মত কালো। আঃ! কি ঠাণ্ডা, কেমন কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে। জলে নেমে তার কাঁখের কলসী কাঁখে রইল, সে অবাক হয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে রইল। কোথা থেকে কে এত জল ঢেলে দিলে? কোথায় এত জল যাচ্ছে? লোকে সব জল তুলে নিয়ে যাবে না ত? তা হ'লে নদী শুকিয়ে যাবে। সে জল নিয়ে ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরল।



একদিন গৃহস্থ দেখে বাড়িময় কেবল জলের কলসী আর জালা! রান্নাঘর থেকে নিয়ে শোবার ঘর, বৈঠকখানা, আঙিনা, সদর দরজা— চারদিকে জলের কলসী আর জালা। গেরস্থ বৌয়ের কাণ্ড দেখে অবাক! সে দূর থেকে বৌকে ডেকে বললে, "বলি ওগো!

ব্যাপারখানা কি বল ত ?” বৌ হেসে বললে, “কেন ? জল তুলে রেখেছি। নদীর জল যদি ফুরিয়ে যায়, তাই। তুমি আমায় তেমন হাবা মেয়ে ভেব না।”

গৃহস্থ হেসে বললে, “মরু দেশের মেয়ে তুমি, তোমায় কে হাবা বলে ? কিন্তু তুমি ঘরবাড়ি এমন ক'রে জালা-কলসীতে ভরে ফেলেছ যে, আমার দাঁড়াবারও জায়গা রাখনি। ও পাগলী ! এ রূপা নদীর জল কি ফুরোবার।”

অনুশীলনী

১। গল্পটি তোমার নিজের কথায় বল।
২। 'গেরস্থের বউ' কাকে বলা হয় ?
৩। মরুভূমি কি রকম ?
৪। মরুভূমিতে জল নেই, কিন্তু তার চারিদিকে অন্য কোন্ জিনিস আছে ?
৫। 'আয় না বৌ, জল আনতে যাই'—এ কথা কারা কার উদ্দেশ্যে বলেছিল ?
৬। 'বলি ওগো ব্যাপারখানা কি ?'—কে কাকে এ কথা বলেছিল ?
৭। মরু দেশের প্রাকৃতিক বর্ণনা কর।
৮। গল্পের বিষয়বস্তু কি ?



হর্ষবর্ধনের ভাই গোবর্ধন

শিবরাম চক্রবর্তী

[**শিবরাম চক্রবর্তী ঃ** শিবরাম চক্রবর্তীর জন্ম হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ জেলায়। শিশু ও কিশোর সাহিত্যে শিবরামের হাসির গল্পের তুলনা হয় না। তিনি ছিলেন হাসির রাজা। এঁর রচিত অসংখ্য হাসির বই কিশোর সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে কলকাতার হালচাল, বাড়ী থেকে পালিয়ে, হর্ষবর্ধনের গল্পসম্ভার বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়।]

'হায় হায়। চোরের পাল্লায় পড়ে বেঘোরে মরতে হলো শেষটায়।' হর্ষবর্ধনকে হায় হায় করতে শোনা যায় একদিন।

'বেঘোরে পড়েছি বলতে পারো দাদা, কিন্তু মারা পড়িনি এখনো আমরা।' দাদার ভুল শোধরায় গোবরা।

'মারা পড়তে কতোক্ষণ? যা সব বিটকেল লোকদের খপ্পরে পড়া গেছে। কলকাতার থেকে কোথায় এনে ফেলেছে কদ্দূরে, তাই তো টের পাচ্ছিনে!'

'কোন্ মুল্লুকে কে জানে!'

'বাইরে বেরিয়ে ঘুরে ফিরে যে একটু জানবো তারও কোনো জো নেই।'

'বাইরে বেরুলেই বা তুমি তা টের পাচ্ছো কি করে দাদা? জায়গার নাম তো আর মাটির গায়ে লেখা নেই।'

'মানুষের মুখে লেখা রয়েছে।'

'মানুষের মুখে!' গোবরার বিস্ময় ধরে না—'মানুষের মুখে আবার মুল্লুকের নাম লেখা থাকে নাকি!'

'উল্লুকের মতো কথা বলিসনে। মুখে না হলেও মুখের ভাষায় বোঝা যায় না কি?' দাদা জানায় 'লোকরা সব বাংলা বলছে, না আসামী বলছে, হিন্দী বলছে, না উড়ে কথা কইছে তাই শুনেই তো

বুঝতে পারবো কোথায় এসে পড়েছি। পূর্ণিয়ায় না কটকে, ছাপরায় না আরা জিলায়, বোম্বায়ে না মাদ্রাজে···না, আর কোনো বেয়াড়া জায়গায়।'

'বোম্বাই নয়, আমি হলপ করে বলতে পারি।' বলে গোবরা, 'বোম্বাই কলকাতার থেকে হাজার মাইল দূরে। এরা তো আমাদের একশো মাইল দূরে এনেছে কেবল ? আর ধরো যদি মাদ্রাজই হয়.... তাহলেও···'।

'তাহলে ?'

'তাহলে তো তুমি ধরতেই পারবে না। সেখানকার লোকেরা সব তামিল ভাষায় কথা বলে। বুঝবে কি করে ? আর তাছাড়া আরো মুশকিল···' গোবরা সমস্যাটা প্রকট করে, 'সেখানে গেলে না খেয়েই মারা পড়তে হবে।'

'কেন, মারা পড়বো কেন ? সেখানে কি বাজার হাট নেই নাকি ? দোকানপাট নেই কি সেখানে ? খাবার কিনে খাবো আমরা।'

'খেতে চাইলেই বা তারা খেতে দেবে কি করে ? তুমি কি চাইছো, খেতে চাইছোই কি না তাই-বা তারা বুঝবে কি করে ? বুঝলে তো দেবে। তামিল-নাদের লোক তোমার নাদ বুঝতে না পারলে—তামিল ভাষায় কথা না কইলে তোমার কোনো হুকুমই তামিল হবে না সেখানে।'

এমন সময় বাড়ির ছাতের থেকে সিঁড়ি বেয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে নেমে এলেন একজন। বাঁটকুল নয়, বিটকেল নয়, বিলকুল ওদের অচেনা।

'কে মশাই আপনি ? গুন গুন করতে করতে কোথা থেকে এলেন আবার ?' হতবাক হর্ষবর্ধনের কথা ফোটে।

'মশাও অবশ্যি গুন গুন করে যত্রতত্র থেকে আসতে পারে বটে···' গোবরা যোগ দেয়। 'কিন্তু জলজ্যান্ত মানুষের পক্ষে আকাশ ফুঁড়ে আসা—?'

'তাছাড়া ছাত থেকে এলেন যে! লোকে তো নীচে থেকেই ওপরে আসে। সদর থেকে আসে অন্দরে···।'

'ছাতে তো আপনি থাকেন না নিশ্চয় ? ছাতে তো দেখিনি

আপনাকে। ছাতে তো উঠেছিলাম একবার—।' গোবরা বলে—'তখন তো কই দেখিনি আপনাকে সেখানে।'

'থাকলে তো দেখবেন? আমি এখনকার কেউ নয় মশাই।' লোকটি জানায়ঃ 'আমি এখানে এসেছি আপনাদের নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্যে···'

'অ্যাঁ! কী বললেন? আমাদের নিয়ে পালাবেন? এরাই তো আমাদের চুরি করে নিয়ে এসেছে। আমরা অপহৃত।'

'অপহরণের ওপর আবার আমি অপহরণ করবো।' লোকটি বলেঃ 'সেইজন্যেই এসেছি আমি।'

'বুঝেছি। আপনারা অন্য এক চোরের দল।'

'না, না, চোর নই আমরা....চোর বলে গাল দেবেন না আমাদের।' সোচ্চার প্রতিবাদ করে সে।

'ছ্যাঁচোর নাকি তবে?'

ছ্যা ছ্যা করে লোকটা—'ছ্যা! চোর ছ্যাঁচোরদের আমরা মানুষ বলেই ধরি না, ওদের আবার একটা পেশা নাকি! চুরি জোচ্চুরি কি ভদ্রলোকের কাজ মশাই? এমন অপবাদ দেবেন না কখনো আমাদের।

'তাহলে আপনারা?'

'আমরা চোরের ওপর দিয়ে যাই।'

'ঠিক বুঝলাম না তো....'

'বুঝবেন বুঝবেন—সময় হলেই বুঝবেন। বোঝাবার সময় নেই এখন। পরে বুঝিয়ে দেবো ভালো করে। এখন, আপনারা এখান থেকে উদ্ধার হতে চান কি চান না?' জিগ্যেস করে লোকটাঃ 'বিটকেলদের হাত থেকে রক্ষা পেতে ইচ্ছুক কি?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।' দুই ভাইয়েরই উৎসাহ হয়ঃ 'কিন্তু কি করে উদ্ধার পাবো? সদর গেটে তালা বন্ধ—দারোয়ানের কড়া পাহারা....'

'ওদিক দিয়েই না। ছাত দিয়ে নিয়ে পালাবো আমি আপনাদের। যেভাবে আমি এসেছি।' বলে লোকটা ছাতের সিঁড়ি ধরে - 'আসুন আমার সঙ্গে।'

হর্ষবর্ধন লোকটার পিছু পিছু ছাতে উঠে দেখেন, বাড়ির এধারকার গা-লাগা গাছটা যেমন গোবর্ধনকে গর্ভে ধারণ করেছিলো,

পেছনদিকেও একটা গাছ তেমনি বাড়ির গা লাগা হয়ে তাদের পৃষ্ঠে বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

'দেখেছেন তো গাছটা?' ওপর চড়াও লোকটি তাঁদের দেখায়ঃ 'গাছটা কেমন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ছাতের ওপর? এই পথেই এসেছি আমি। এখন এর শাখাপ্রশাখা ধরে ওপরে উঠে যান, তারপর বেয়ে তর তর করে নেমে পড়ুন তলায়। উঠতে পারবেন তো গাছে?'



'তা পারবো না! বলে গাছ নিয়েই আমাদের কাজ। কাঠের কারবারী আমরা।' হর্ষবর্ধন বললেনঃ 'কতো গাছকে কেটে তক্তা বানিয়ে ফেললাম বলতে গেলে। আর গোবরা? ওতো ছোটোবেলার থেকে গাছের কোলে-পিঠেই মানুষ। আমগাছেই বাস করতো। রাতদিন।'

'আম পাকলেই অবশ্যি।' গোবরার প্রতিবাদঃ 'দিনরাত নয়। আর সারা বছর ধরে কখনোই না।'

মাটিতে পা দিয়ে হাঁপ ছাড়লেন হর্ষবর্ধন ঃ 'বাঁচলাম বাবা! চোরের হাত থেকে বাঁচা গেলো।' [সংক্ষিপ্ত]

অনুশীলনী

১। কাহিনীটি তোমার নিজের কথায় বল।

২। গল্পের নামকরণ সম্বন্ধে তোমার কি মত?

৩। হর্ষবর্ধন কে?

৪। গোবর্ধন কে?

৫। দাদার ভুল কে শোধরাল?

৬। 'কোথায় এসে পড়েছি।' কে বলেছিল এবং কেন বলেছিল?

৭। অচেনা ভদ্রলোক কি বললেন?

৮। 'চোরের উপর দিয়ে যাই'—কেন এই কথা বলা হল?

৯। 'ওদের' কিভাবে উঠতে বলা হল?

১০। 'চোরের হাত থেকে বাঁচা গেল।' কে বলেছিল এবং কেন?



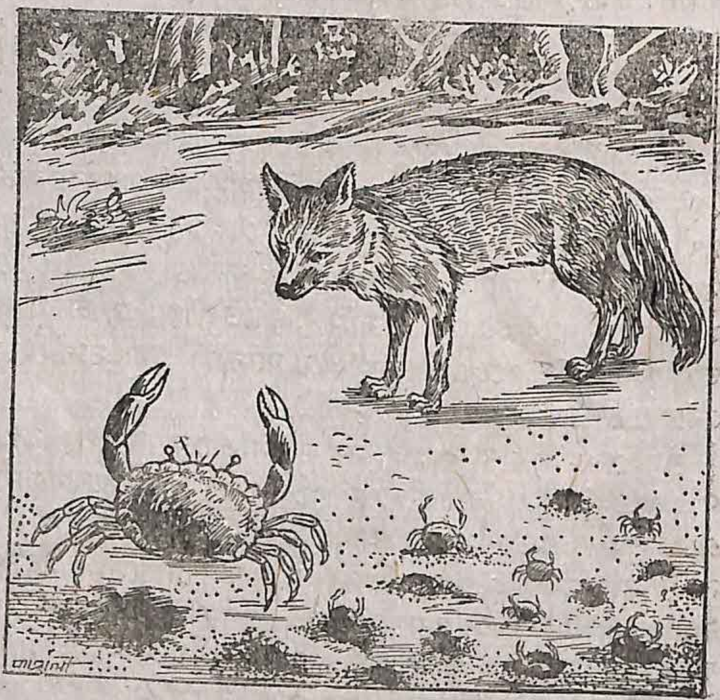
[লীলা মজুমদার ঃ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। শিশু ও কিশোর সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখিকা হিসাবে এঁর নাম। এঁর রচিত ছোটদের জন্য গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়ের সহদোরা।]

রায় দিঘীর লঞ্চ ঘাট থেকে বেরিয়ে মাতলা নদীর পথ ধরে কিছু দূর এগিয়ে গেলেই পথে পড়বে কুলতলী এলাকার বিশ নম্বর লাট। পাখীয়ালা, ঘটি হারানিয়া, দেউল বাটি, অনেক দূরে মনসা দ্বীপ। মনসা দ্বীপে সুন্দরবনের বাঘেদের মাসি বাড়ী। দ্বীপের চরাতে জেলেরা মাছ শুকোতে দেয়। মাসি বাড়ীতেও ছিটে-ফোটা মাছের ভেট যায়। দিব্বি সুখে আছে সেখানে মাসিরা। অমন সুখ ছেড়ে, খাবার ছেড়ে কে আর যেতে চায়?

বাঘেদের মামাবাড়ী কাছেই, মনুষ্য বসতি ঘেরা দ্বীপের কাছা-কাছি কয়েকটি দ্বীপে বসতি স্থাপন করে আছে বাঘেদের মামারা। তাদের একশ একতম পুরুষ আমাদের বর্তমান শেয়াল পণ্ডিত-মশাইরা। খুব উঁচু বংশ, শিক্ষা, দীক্ষা, পাণ্ডিত্যে ও সর্বশেষ চালাকিতে ও ধূর্তমিতে পশুকুল শ্রেষ্ঠ। পাশেই পণ্ডিতমশাইয়ের পাঠশালা, লতাপাতা গাছপালাতে ঘেরা। আগে কুমির মারির ছেলেমেয়েরা পড়তে আসত, এখন আর আসে না। তার কত ছাত্রছাত্রী যে এক কালে উচিত মত বিদেশী শিক্ষা পেয়ে "হটক-হলমের" অন্তর্দেশে "পাকস্থলীতে" গিয়ে উচ্চ-শিক্ষা নিয়েছে তার হিসাব কে রাখে? এখন ছাত্রছাত্রীর অভাবে পাঠশালা বন্ধ। বন্ধ রুজি-রোজগার, খাবার-দাবার, মাঝে মাঝে তাই মনুষ্য বসতিতে গিয়ে হানা দিতে হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও, চুরি করে আনতে হয় হাঁসটা মুরগিটা কিন্তু তাতেও বিপদ, ধরা পড়ে প্রাণ যাওয়ার ভয়।

কিন্তু না খেয়ে তো আর পারা যায় না। তাই খাবার খোঁজে বেড়াতে হয়।

নদীর চড়ার পাশ ঘেঁষেই বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত! সমুদ্রের নোনা জল বাঁধ ভেঙ্গে পার্শ্ববর্তী মাঠে, ধানক্ষেতে প্রবেশ করে। সঙ্গে প্রবেশ করে কাঁকড়ার ডিম, ছোট ছোট কাঁকড়া। ধানক্ষেতেই বড় হয়। আলের কাছে বা নদীর চড়ায় এসে গর্ত করে বাসা বাঁধে। ধান কাটার সময় ছোট বড় কাঁকড়া ধরা পড়ে। এই সময় রাতের অন্ধকারে শেয়ালের আনাগোনা শুরু হয়!



পড়ন্ত শীতের বেলায় শেয়াল পণ্ডিত সেজেগুজে চললেন খাবার খোঁজে। হাতে ছড়ি, পায়ে নতুন চটি, নাকের ডগায় চশমা, কাঁধে চাদর, মুখে পাইপ, রায় দিঘী, কঙ্কন দিঘী পেরিয়ে ধানক্ষেত, কখনও বা তার আল দিয়ে, কখনও বা মাতলা নদীর তীর ঘেঁষে সাবধানে চললেন পণ্ডিতমশাই, এসে হাজির হলেন পাখীয়ালায়। গহন গভীর বন। বনে নানান জাতের পাখীদের বাস। পাশ দিয়ে

বয়ে চলেছে ধীর শান্ত মাতলা নদী। নদীর দুপাশে বিস্তীর্ণ বালুচর জোয়ারের সময় জলে ডুবে যায়, ভাঁটার সময় জেগে ওঠে। চরে ইতস্ততঃ গর্ত। চড়ার ওপর এলোমেলো দাগ কেটে কেটে তির তির করে হেঁটে বেড়াচ্ছে শত শত ছোট বড় কাঁকড়া। সারা গায়ে কাদা। কেউ বা গর্ত থেকে উঠে আসছে কেউবা গর্তে ঢুকেছে।

কাঁকড়া বুড়ো চারপাশে ঘুরে ঘুরে নজর রাখছিলো ওদের প্রতি। হঠাৎ দূর থেকে শেয়াল পণ্ডিতকে আসতে দেখেই কি যেন ইঙ্গিত করল অমনি সবাই টুকটুক করে মুহূর্তের মধ্যে যে যার গর্তে ঢুকে পড়ল। কাঁকড়া বুড়ো এগিয়ে গিয়ে শেয়াল পণ্ডিতকে তার দুটি দাঁড়া উঁচিয়ে নমস্কার জানাল। বলল—তা এমন অবেলায় সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছেন পণ্ডিতমশাই ?

আসছিলাম কুমির মারির চরের দিকে, অনেকদিন হল নানান কাজের ঝামেলায় ওদের খোঁজ খবর নিতে পারিনি, তা ভাবলাম যাচ্ছিই যখন ওদিকে ত তোমাদেরও খোঁজ খবরটাও নিয়ে যাই, তাই আসা আর কি ? মনের কথা চেপে রেখে পণ্ডিতমশাই উত্তর দিল।

কাঁকড়া বুড়ো কিন্তু শেয়াল পণ্ডিতের চোখে মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারল এখানে ওর আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। বলল—'সে ভালই হল। আসছেন যখন তখন কটা দিন না হয় থেকেই যান।'

শেয়াল মনে মনে ভাবল,—থাকলে মন্দ হয় না! পেট পুরে কটা দিন কাঁকড়া খাওয়া যাবে।

অনুশীলনী

১। গল্পটি তোমার নিজের কথায় বল।
২। এ গল্পের নামকরণ সম্বন্ধে তোমার কি মত ?
৩। মজার গল্পের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ কর।
৪। 'মনসা দ্বীপ' কোথায় ?
৫। কাহিনীর প্রাকৃতিক বর্ণনা কর।
৬। পণ্ডিতমশাই কোথায় চলেছেন ?
৭। শেয়ালের কথা কি জান ?
৮। কুমির মারির চর কাকে বলে ?
৯। শেয়াল পণ্ডিতের কথা কি জান ?
১০। গল্পের বিষয় অবলম্বন করে একটি কাহিনী তৈরী কর।



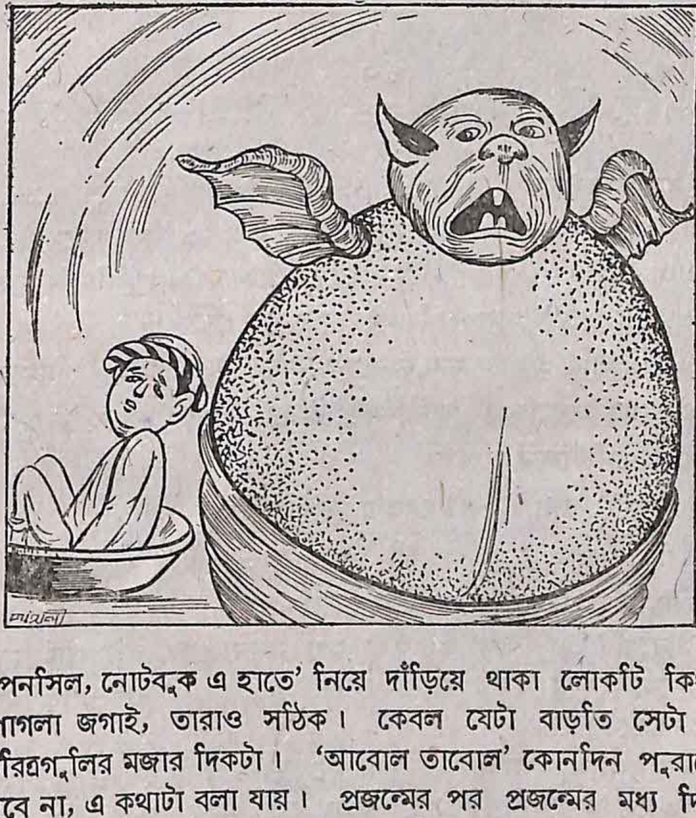
[সত্যজিৎ রায়ঃ ১৯২১ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়ের পুত্র। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে ইনি পৃথিবী বিখ্যাত। শিশু ও কিশোর সাহিত্যে ইনি অতুলনীয়। এঁর রচিত ফেলুদার গল্পগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।]

১৯২১ সালের ২ মে আমার জন্ম। তার আগেই বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তারপর আমার দু বছর বয়সে ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তিনি চলে গেলেন।

ন'দিন পর বই হয়ে বেরল 'আবোল তাবোল'। পুত্র হিসেবে পিতা সম্পর্কে কিংবা 'আবোল তাবোল' নিয়ে আমার কোন স্বতন্ত্র বিশিষ্ট স্মৃতি কিছু নেই। কেউ কেউ বলেন, রামগরুড়ের ছানা, ট্যাঁশ গরু বা কাঠবুড়ো লিখবার সময় বাবা কোন জীবিত মানুষকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন।

'বুঝিয়ে বলার' মত উদ্ভট পাণ্ডিত্য নিয়ে ঘুরে বেড়ান, এমন মানুষ তো কিছু কিছু রয়েছেনই। কিন্তু সত্যি তাঁরা ছিলেন কিনা এ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমার আলাদা কিছু জানা নেই। আর দশজন বাঙালী ছেলের কাছে ছোটবেলায় 'আবোল তাবোল' যে আকর্ষণ নিয়ে আসে, আমার কাছেও তাই। আর 'আবোল তাবোল' সম্পর্কে এত কথা বলা হয়েছে যে নতুন করে আর নতুন কোন কথা শোনাবার নেই। এটুকু বলতে পারি, এমনটি কোনদিন হয়নি, আর হবেও না। লেখা এবং ছবির এমন সাযুজ্য, এমন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ দুর্লভ। প্রতিটি লেখার সঙ্গে যে ছবিটি তিনি এঁকেছেন, এছাড়া অন্য কোন রকম ভাবে এর চেয়ে ভাল করে সেই কবিতার চরিত্র বা ব্যঞ্জনাটিকে প্রকাশ করা যেত না।

'কুমড়ো পটাশ' কিংবা 'খিচুড়ির' হাঁসজারু, গিরগিটিয়া বকচ্ছপ —এইসব কল্পনার প্রাণীগুলিকে অন্য কোন চেহারায় ভাবাই যায় না। যেসব চরিত্র পরিচিত, যেমন নোটবইয়ের সেই 'এই দেখ



পেনসিল, নোটবুক এ হাতে' নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি কিংবা পাগলা জগাই, তারাও সঠিক। কেবল যেটা বাড়তি সেটা ঐ চরিত্রগুলির মজার দিকটা। 'আবোল তাবোল' কোনদিন পুরানো হবে না, এ কথাটা বলা যায়। প্রজন্মের পর প্রজন্মের মধ্য দিয়ে 'আবোল তাবোল' তার বিশিষ্ট জায়গাটির দখল রেখে চিরকাল এক বিস্ময় হয়ে থাকবে।

অনুশীলনী

১। ১৯২১ সালে কার জন্ম ?
২। ১৯২৩ সালে কার মৃত্যু হয় ?
৩। 'আবোল তাবোল' কি ধরনের গ্রন্থ ?
৪। 'আবোল তাবোল' প্রসঙ্গে লেখক কি বলেছেন ?
৫। 'কোনদিন হয়নি আর হবেও না'—এ কথার অর্থ কি ?
৬। চরিত্রের মজার দিকটা কি ?
৭। চিরকাল বিস্ময় হয়ে থাকবে। কি প্রসঙ্গে কেন বিস্ময় হয়ে থাকবে ?



মাছির বায়না

সুকান্ত ভট্টাচার্য

[সুকান্ত ভট্টাচার্য : ১৯৩৩ সালে ইনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা কাব্য সাহিত্যে এঁর দান অসামান্য। মাত্র ২১ বছর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। এঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'ছাড়পত্র' বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।]

একটি মাছি একজন মানুষের কাছে উড়ে এসে বলল—তুমি সব জানোয়ারের মুরুব্বি। তুমি সব কিছুই করতে পার, কাজেই আমাকে একটি লেজ দাও।

মানুষটি বলল : কী দরকার তোমার লেজের ?

মাছিটি বলল : আমি কী জন্যে লেজ চাইছি ? যে জন্যে সব জানোয়ারের লেজ আছে সুন্দর হবার জন্যে।

মানুষটি তখন বলল : আমি তো কোনো প্রাণীকেই জানি না যার শুধু সুন্দর হবার জন্যে লেজ আছে। তোমার লেজ না হলেও চলবে।

এই কথা শুনে মাছিটি ভীষণ ক্ষেপে গেল আর সে লোকটিকে জব্দ করতে আরম্ভ করে দিল। প্রথমে সে বসলো তার আচারের বোতলের ওপরে, তারপর নাকে সুড়সুড়ি দিল, তারপর এ কানে—ও কানে ভন্‌ভন করতে লাগল। শেষকালে লোকটি বাধ্য হয়ে তাকে বললে : বেশ, তুমি উড়ে উড়ে বনে, নদীতে, মাঠে যাও, যদি তুমি কোনো জন্তু, পাখি কিংবা সরীসৃপ দেখতে পাও যার কেবল সুন্দর হবার জন্যেই লেজ আছে তার লেজটা তুমি পুরো নিতে পারো। আমি তোমাকে পুরো অনুমতি দিচ্ছি।

এই কথা শুনে মাছিটি আহ্লাদে আটখানা হয়ে জানালা দিয়ে সোজা উড়ে চলে গেলো। বাগান দিয়ে যেতে যেতে সে দেখতে পেল

—একটি গুটিপোকা পাতার ওপর হামাগুড়ি দিচ্ছে। সে তখন গুটিপোকার কাছে উড়ে এসে চেঁচিয়ে বলল ঃ গুটিপোকা! তুমি তোমার লেজটা আমাকে দাও, ওটা তো কেবল সুন্দর হবার জন্যে।

গুটিপোকা ঃ বটে? বটে? আমার মোটে লেজই হয়নি, এটা তো আমার পেট। আমি এটাকে টেনে ছোট করি, এইভাবে চলি। আমি হচ্ছি যাকে বলে বুকে হাঁটার প্রাণী!

মাছি দেখল তার ভুল হয়েছে। তাই—সে উড়ে গেল। তারপর সে নদীর কাছে এল। নদীর মধ্যে ছিল একটা মাছ আর একটা চিংড়ি। মাছি মাছটিকে বলল ঃ তোমার লেজটা আমায় দাও। ওটা তো তোমার সুন্দর হবার জন্যে আছে।

মাছ বলল ঃ এটা কেবল সুন্দর হবার জন্যে আছে তা নয়, এটা আমার দাঁড়। তুমি দেখ, যদি আমি ডান দিকে বাঁকতে চাই, তাহলে লেজটা আমি বাঁ দিকে বাঁকাই আর বাঁদিকে চাইলে ডানদিকে বাঁকাই। আমি কিছুতেই আমার লেজটি তোমায় দিতে পারি না।

মাছি তখন চিংড়িকে বলল ঃ তোমার লেজটা তাহলে আমায় দাও চিংড়ি।

চিংড়ি জবাব দিল ঃ তা আমি পারব না। দেখ না আমার পাগুলো চলার পক্ষে কি নরম, সরু ও দুর্বল, কিন্তু আমার লেজটি চওড়া ও শক্ত। যখন আমি জলের মধ্যে এটা নাড়ি তখন এ আমায় ঠেলে নিয়ে চলে। নাড়িচাড়ি আর যেখানে খুশী সাঁতার দিয়ে বেড়াই। আমার লেজও দাঁড়ের মত কাজ করে।

মাছি আরো দূরে উড়ে গেল।

ঝোপের মধ্যে মাছি একটা হরিণকে তার বাচ্চার সঙ্গে দেখতে পেল। হরিণটার ছোট্ট একটা লেজ ছিল ক্ষুদে নরম, সাদা লেজ। অমনি মাছি ভনভন করতে আরম্ভ করল। তোমার ছোট্ট লেজটি দাও না হরিণ।

হরিণ ভয় পেয়ে গেল।

হরিণ বললে ঃ কেন ভাই? কেন? যদি আমি তোমায় লেজটা দিই, তা হলে আমি যে আমার বাচ্চাদের হারাব। অবাক হয়ে মাছি বললে ঃ তোমার লেজ তাদের কী কাজে লাগবে?

হরিণ বললে ঃ বাঃ কী প্রশ্নই না তুমি করলে। ধর, যখন

একটা নেকড়ে বাঘ তাড়া করে তখন আমি বনের মধ্যে ছুটে গিয়ে লুকোই আর ছানারা আমার পিছু নেয়। কেবল তারাই আমায় গাছের মধ্যে দেখতে পায়, কেন-না আমার ছোট্ট সাদা লেজটা রুমালের মতো নাড়ি, যেন বলি ঃ এই দিকে বাছারা, এই দিকে। তারা তাদের সামনে সাদা মতো কিছু নড়তে দেখে আমার পিছু নেয় আর এইভাবেই আমরা নেকড়ের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচি।



নিরুপায় হয়ে মাছি উড়ে চলে গেল। সে উড়তে লাগল— যতক্ষণ না সে একটা বনের মধ্যে গাছের একটা কাঠঠোকরাকে দেখতে পেল।

তাকে দেখে মাছি বলল ঃ কাঠঠোকরা তোমার লেজটা আমায় দাও। এটা তো তোমার সুন্দর হবার জন্য।

কাঠঠোকরা বললে ঃ কী মাথামোটা তুমি! তাহলে কী করে

আমি কাঠ ঠুকরে খাবার খাব? কী করে বাসা তৈরী করব বাচ্চাদের জন্য?

মাছি বলল: কিন্তু তুমি তো তোমার ঠোঁট দিয়েই করতে পার।

কাঠঠোকরা জবাব দিল: ঠোঁট কেবল ঠোঁটেই, কিন্তু লেজ ছাড়া আমি কিছুই করতে পারি না। তুমি দেখ, কীভাবে আমি ঠোকরাই।

কাঠঠোকরা তার শক্ত লেজ নিয়ে গাছের ছাল আঁকড়ে ধরে গা দুলিয়ে এমন ঠোকর দিতে লাগল যে তার থেকে ছালের ছোবরা উড়তে লাগল।

মাছি এটা না মেনে পারল না যে, কাটঠোকরা যখন ঠোকরায়, তখন সে লেজের ওপর বসে। এটা ছাড়া সে কিছুই করতে পারে না। এটা তার ঠেক্‌নার কাজ করে।

মাছি আর কোথাও উড়ে গেল না। মাছি দেখতে পেল সব প্রাণীর লেজই কাজের জন্য। বেদরকারী লেজ কোথাও নেই, না, নদীতেও না। সে মনে মনে ভাবল—বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কি? আমি লোকটাকে সোজা করবই। যতক্ষণ না সে আমাকে লেজ দেয় আমি তাকে কষ্টই দেব।

মানুষটি জানালায় বসে বাগান দেখছিল। মাছি তার নাকে এসে বসল। লোকটি নাক ঝাড়া দিল কিন্তু তখন সে তার কপালে গিয়ে বসে পড়েছে। লোকটি কপাল নারল—মাছি তখন আবার তার নাকে।

লোকটি কাতর প্রার্থনা জানাল—আমায় ছেড়ে দাও মাছি। ভন্‌ভন্‌ করে মাছি বলল: কিছুতেই তোমায় ছাড়ব না। কেন তুমি আমায় অকেজো লেজ আছে কিনা দেখতে পাঠিয়ে বোকা বানিয়েছ? আমি সব প্রাণীকেই জিজ্ঞেস করেছি—তাদের সবার লেজই দরকার।

লোকটি দেখল মাছি ছাড়বার পাত্র নয়। এমনই বদ এটা। একটু ভেবে সে বলল: মাছি, মাছি! দেখ, মাঠে গরু রয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করো তার লেজের কি দরকার!

মাছি জানালা দিয়ে উড়ে গিয়ে গরুর পিঠে ভন্‌ভন্‌ করে জিজ্ঞেস করল: গরু! গরু! তোমার আবার লেজ কিসের জন্যে?

গরু একটি কথাও বলল না। একটি কথাও না।

তারপর হঠাৎ সে তার লেজ দিয়ে পিঠে সপাৎ করে মারল আর মাছি ছিটকে পড়ে গেল।

মাটিতে পড়ে মাছির শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল—পা দুটো উঁচু হয়ে রইল আকাশের দিকে।

লোকটি তাই না দেখে বলল: এই ঠিক করেছে মাছির। মানুষকে কষ্ট দিও না—প্রাণীদের কষ্ট দিও না। তুমি কেবল আমাদের গুলিয়ে মেরেছ।

অনুশীলনী

১। গল্পটি নিজের ভাষায় বল।
২। বায়না কাকে বলে?
৩। মাছি লোকটার কাছে কি চেয়েছিল?
৪। লোকটা তার উত্তরে কি বলল?
৫। গুটিপোকার কাছে মাছি কি চাইল? তাতে গুটিপোকা কি উত্তর দিল?
৬। নদীর কাছে কাকে দেখতে পেল?
৭। মাছ কি বলল?
৮। হরিণকে দেখতে পেয়ে মাছি কি বলল?
৯। কাঠঠোকরা কি বলেছিল?
১০। গরু শেষ পর্যন্ত মাছিকে কি ভাবে মেরে ফেলল?